শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শ্রুভাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

পরিবর্তন

পূজোর ছুটির পরেই মিনি ফিরলো যখন দেশে,
কলকাতাতে এসে
চল্‌লো ছুটে পাশের বাড়ী, বিনী যেখানে আছে।
কী দেখেছে ছুটির ক'দিন বলবে সে তার কাছে—
ঝর্‌না পাহাড় মাঠের ধারে ফুলের রাশি ফোটে
ছোট্ট নদী নিরবধি বালুর চরে লোটে।
সকাল সাঁঝে বেড়িয়েছে সে কতই খুশী মনে
দল বেঁধে সব চড়ুইভাতি শালের বনে বনে।
হরেক রকম হৈ-হল্লা করলো সারা দিনই
বিনির কাছে আজকে গেলো বলতে সে সব মিনি!

দেখা হতেই মিনির সাথে বন্ধু বিনি বলে
অবাক্ কুতূহলে—
"ফিরলি তোরা কবে মিনি? সত্যি, ওমা! এ কি—
আজব ব্যাপার দেখি!
চেহারাটা বদলে গেছে,—স্বাস্থ্য গেছে ফিরে,
রঙের জলুস জোর বেড়েছে! ব্যাপারখানা কি রে?

মিনি বললে "খুব ঘুরেছি, ঝর্‌না নদীর লেকে
স্নান করেছি গা ধুয়েছি "মার্গো সাবান" মেখে।
রং হয়েছে ফর্সা তাতেই, স্বাস্থ্য হোলো ভালো—
শরীরটা তাই আমার আরও হয়েছে জমকালো!"
এই না বলে হাসলো মিনি, ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে,
মুক্তো সম দাঁতগুলি তার ঝল্‌তে যেন থাকে।
বিনি বললে, 'দাঁতগুলি সাফ করলি কি কৌশলে?'
মিনি বললে, 'নিম টুথপেষ্ট্' ব্যাভার করার ফলে!

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার-কৃত

পৌরাণিক অভিধান

মানব সভ্যতার সব চেয়ে বড়ো সুকীর্তি হ'ল বই। হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি ও জীবনধারার বহু বিচিত্র স্বাক্ষর অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বিধৃত হ'য়ে থাকে শুধু বইয়ের পৃষ্ঠাতেই। সদ্য-প্রকাশিত 'পৌরাণিক অভিধান' এমনি অসংখ্য বইয়ের সার-সমৃদ্ধ বিরাট সংগ্রহ-গ্রন্থ। কেবলমাত্র অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ নয়,—সমগ্র বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, সংহিতা সম্পর্কিত অসংখ্য চরিত্র ও আশ্চর্য কাহিনী এই গ্রন্থে মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত হয়েছে। সাধারণ অভিধানের সমগোত্র নয় বলেই 'পৌরাণিক অভিধান'-এর সরস কাহিনীগুলি প'ড়ে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা পরিতৃপ্ত হবেন এবং ছাত্র, শিক্ষক ও সাহিত্যকর্মীরাও উপকৃত হবেন অজস্রভাবে। দেব-দেবীগণের সুন্দর ও সুশোভন চিত্রগুলিও এই অভিধানের অন্যতম আকর্ষণ

মূল্য : সাত টাকা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

খোকার কথা!

রচনা লিখে নিয়ে যাই না – তাই
মাষ্টারের বকুনি রোজ খাই –
আর খাবো না, যাবো না স্কুলে,
খোকন বলে ভীষণ রেগে ফুলে ॥

অফিস থেকে এসে
বাবা বলেন হেসে :
রচনা তুমি লেখোনা-এতো তোমারি অন্যায়!
খোকন বলে : কালি কোথায়? কালি বিনে
কি রচনা লেখা যায়?

দাদা বলেন : অনেক কালি আছে দিদির
কাছে,
আমারো আছে বিলেতী কালি দেরাজে
এক ডজন,
এসব দিয়ে লেখো না কেন? বকছো
শুধু বাজে।
লেখার ভয়ে কালির দোষ দিচ্ছ কেন
খোকন?

খোকন বলে ঘাড় বেঁকিয়ে, দু'চোখ
ক'রে টেরা :
তোমার কালি, দিদির কালি, কালিতো
নয় ছাই!
লেখার মতো লিখতে হ'লে সব
দেশের সেরা
সবার প্রিয় 'সুলেখা' কালি চাই ॥

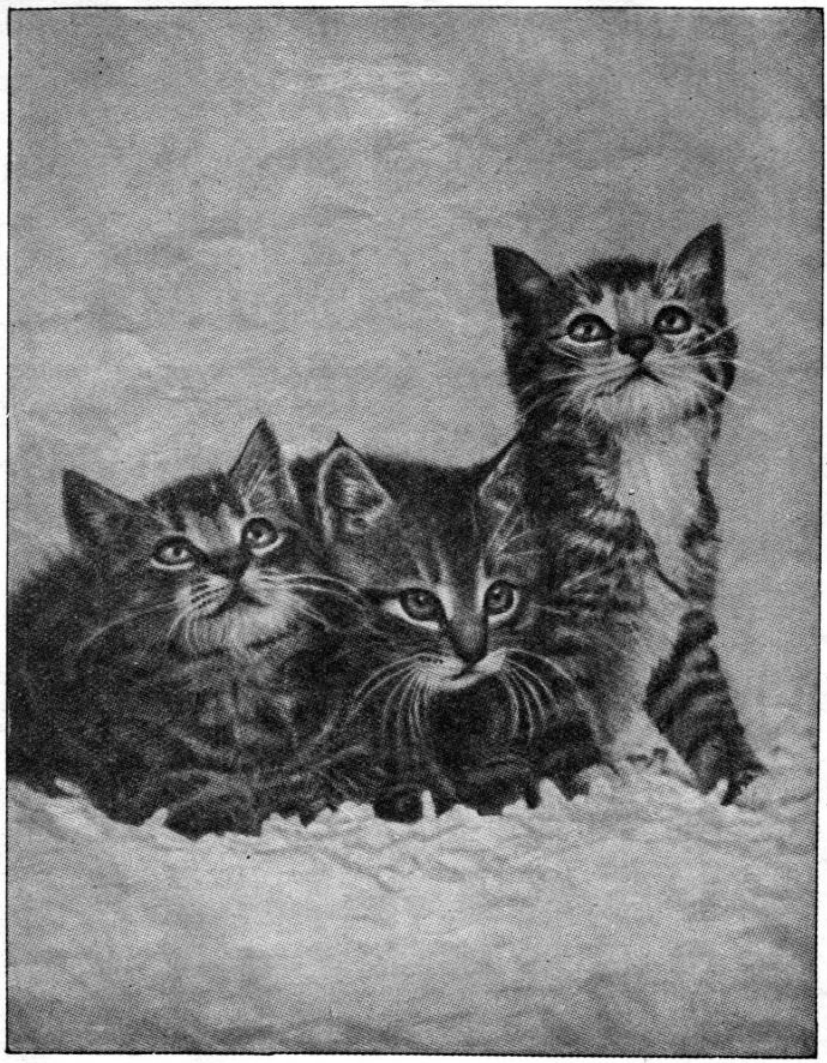

আমরা তিনটি ভাই
শিবের গাজন গাই।'

৩৯ বর্ষ]　　আশ্বিন—১৩৬৫　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

ছাতা ও জুতা

বাণীকুমার

একদিন কোন্ জ্যেষ্ঠ মাসে
　　দুপুর বেলায় রোদ্দুরে,
জমদগ্নি করেন খেলা
　　ধনুক দিয়ে তীর ছুঁড়ে।

রেণুকা-বউ যান্ বারেবার
　　আন্‌তে ছুটে তীরগুলি,
কাঠফাটা রোদ লাগলো মাথায়,
　　পায়ের মাটি যায় দুলি'।

সূর্য-তাপে কষ্ট পেয়ে—
　　বসেন তিনি গাছের ছয়;
ফিরতে দেরি—দেখে ঋষি
　　হলেন রেগে অগ্নি-প্রায়।

গর্জে ওঠেন ঋষি তবে :
　　"কিসের দেরি আন্‌তে শর ?"
রেণুকা কন্ : "রোদের আগুন
　　ভোগায় মোরে নিরন্তর।"

কহেন জমদগ্নি হেঁকে :
"শাস্তি দেবো সূর্যেরে।"
দিব্য-ধনু নিলেন হাতে
আর শত বাণ তূণ ভ'রে।

জানো নাকি—সূর্য কভু
আকাশে না রহেন স্থির।
তবে তুমি—হে ঋষিবর,
কী ক'রে তাঁয় বিঁধ্‌বে তীর?"

ব্রাহ্মণেরি বেশে রবি
আসিয়া কন্ সম্মুখে :
"সূর্য-নিপাত দিয়ে কী লাভ,
কেন করো কোন্ দুখে?

কহেন ঋষি : "জ্ঞানের চোখে
তোমায় আমি খুব জানি,
দুপুরে আধ-নিমেষ থামো—
তখন দিব তীর হানি'।"

সূর্য-কিরণ যে-রস টানে,
সে-রস ঝরে বর্ষাতে,
তাইতো লোকে অন্ন লভে,
চাহো কি সে খণ্ডাতে?

সূর্য ঋষির শরণ নিতে,
ঋষি তাঁরে দেন অভয়,
চান্ যে উপায়—তপ্ত পথে
লোকের না আর কষ্ট হয়।

সূর্য তখন ঋষির হাতে
দিলেন জুতা আর ছাতা,
কহেন : "দুই-এ আমার তাপে
বাঁচবে চরণ আর মাথা।"

—

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রণে কিছুতেই ভঙ্গ দেবেননা স্বামীজি। দেখে যাবেন শেষ পর্যন্ত।

'এখন অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করছি।' লিখছেন স্বামীজি: 'বারে বারে মনে হচ্ছিল এদেশ ছেড়ে চলে যাই। কিন্তু আবার মনে হচ্ছিল আমি একগুঁয়ে দানা, এত সহজেই হেরে যাব? আমি কি ঈশ্বরের কাছ থেকে আদেশ পাই নি? আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তিনি তো সব দেখছেন। তাঁর চিরজাগ্রত চক্ষু তো এক মুহূর্তের জন্যেও অস্ত যাচ্ছেনা। তবে আর ভয় কি, মরি-বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য যেন না টলে।'

শোনা গেল বোস্টনে খরচ কম, সুতরাং বোস্টনের দিকে যাত্রা করলেন স্বামীজি। আর সেই ট্রেনে মিস কেট স্যানবর্ণের সঙ্গে দেখা।

বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা, অনিমেষে তাকিয়ে রইলেন স্বামীজির দিকে। এ কে প্রদীপ্ত-পুরুষ। আকাশের সুবর্ণসূর্য যেন নেমে এসেছে মাটিতে।

আলাপ শুরু করলেন মহিলা।

'কতদূর যাবে?'

'বোস্টন।' বললেন স্বামীজি।

'উঠবে কোথায়?'

'জানিনা। শুনেছি বোস্টন সস্তার জায়গা, দেখি কোনো একটা সাদাসিদে হোটেল পাই কিনা।'

'আচ্ছা, তুমি তো ভারতীয় সন্ন্যাসী—তাই না?'

সায় দিলেন স্বামীজি।

'আমেরিকায় এসেছ কেন?' কৌতূহলে একাগ্র মিস স্যানবর্ণ।

'বেদান্ত প্রচার করতে। আসল উদ্দেশ্য ছিল শিকাগোতে ধর্মসভায় যোগ দেব, কিন্তু সভা আরম্ভ হতে এখনো আরো প্রায় তিন সপ্তাহ বাকি। এতটা সময় শিকাগোতে থাকি আমার এমন রসদ নেই। তাই চলেছি সস্তার জায়গার উদ্দেশে।

'তুমি আমার ওখানে যাবে? আমার অতিথি হবে?' মিস স্যানবর্ণ আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

অবন্ধু বিদেশে এ কার স্নেহস্বর! এ কার হাত বাড়ানো!

'তুমি থাকো কোথায়?' কৃতজ্ঞ চোখে মহিলার করুণামাখানো নীল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন স্বামীজি।

'বোস্টনের কাছে এক গ্রামে মাসাচুসেটস-এ আমি থাকি।' বললেন মিস স্যানবর্ণঃ আমার কুটিরের নাম 'ব্রীজি মেডোজ'—হাওয়াখাওয়া মাঠ। বাড়ির চারদিকে পাইন আর রুপোলি বার্চ, দেওয়ালবাওয়া আঙুরের লতা। পদ্মফুলে ভরা দিঘি, আর কাছেই দুটো ঝর্ণা, তাদের ধারে ধারে ফরগেট-মি-নট ফুটে আছে। যাবে তুমি?'

'যাব।'

মিস স্যানবর্ণের বেশ সচ্ছল অবস্থা, প্রসন্ন আতিথেয়তায় গ্রহণ করলেন স্বামীজিকে। রোজ এক পাউণ্ড করে খরচ বেঁচে যেতে লাগল স্বামীজির। কিন্তু স্যানবর্ণের লাভ কি? বন্ধুমহলে একটি ভারতীয় কিউরিয়ো দেখিয়ে প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছেন। দেখ দেখ কি অদ্ভুত পোশাক। মাথায় একটা কাপড়ের স্তূপ তারপরে আবার একটা পুচ্ছ ঝুলছে। আর গায়ে এই লম্বা ঢিলে বালিশের অড় দেখেছ, একটা গোটা মানুষই আস্ত খোলের মধ্যে। যে দেখে সেই হাঁ করে থাকে। রাস্তায় বেরুলেই টিটকিরি দেয়।

উপায় নেই, এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে মুখ বুজে। সমস্ত উদ্ধত বিরুদ্ধতাকে বিগলিত করব, সমস্ত বিদ্রূপকে নিয়ে যাব অমিশ্র স্তুতিতে—তবেই তো আমি বিবেকানন্দ।

একদিন দু ঘোড়ার গাড়িতে করে মিস স্যানবর্ণ স্বামীজিকে নিয়ে বেরুলেন রাস্তায়। সাধককে কে চিনতে পারবে, ভাবল ভারতের কোনো রাজারাজড়া চলেছেন বেড়াতে। খবরের কাগজে বেরুল ভারতবর্ষের এক রাজা এসেছে স্যানবর্ণের কুটিরে। তার যেমন রূপ তেমন শোভা। সর্বোপরি তার বিচিত্র বেশ।

শুধু পোশাক দেখবার জন্যেই কাতার দিয়ে লোক দাঁড়ায় রাস্তায়। স্বামীজি ঠিক করলেন, সাধারণ চালচলনে চলবেন। গেরুয়া, কালো লম্বা একটা কোট তৈরি করে নিতে হবে। যদি সভায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় বক্তৃতা দিতে তখন পরব আমার রাজবেশ—আলখাল্লা আর পাগড়ি। এই এখানকার মেয়েদের পরামর্শ। আর পোশাকব্যাপারে মেয়েরাই সর্বময়ী কর্ত্রী এখানে। কিন্তু চলনসই একটা পোশাক করতে তিনশো টাকা খরচ। হাতে মোটে ষাট পাউণ্ড অবশিষ্ট।

যা থাকে অদৃষ্টে, বোস্টনে গিয়ে পোশাকের অর্ডার দিলেন স্বামীজি। কিছু টাকা পাঠাবার কথা লিখলেন আলাসিঙ্গাকে।

'যদি নাও পারো, আমি ছাড়বনা, আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখব। আমি যদি এখানে রোগে শীতে বা অনাহারে মরে যাই, তোমরা আছ, তোমরাই এই ব্রত নিয়ে উঠে পড়ে লাগবে। কি ব্রত? শুধু পবিত্রতা সরলতা আর বিশ্বাস। অগ্নিময় বিশ্বাস। রোম একদিনে নির্মিত হয়নি। প্রভু আমাদের নেতা, জয় দাও প্রভুর। আমরা জ্যোতির তনয়, জয় দাও জ্যোতির্ময়ের। তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ তুচ্ছ ক্ষুধা তুচ্ছ শীত। শুধু অগ্রসর হও। কে পড়ল চেয়ে দেখোনা। একজন পড়বে তো আরেকজন তার জায়গা নেবে। বন্ধ হবেনা অগ্রগতি।'

রমাবাঈ হিন্দু মেয়ে, খৃস্টান হয়েছে। আমেরিকায় ঘুরে ঘুরে মেয়েদের ক্লাব খুলছে। হিন্দু বালিকাবিধবাদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, তারই প্রতিকারের জন্যে ঐসব ক্লাবের সাহায্যে চাঁদা তুলছে অজস্র। দুর্দশা, তাতে সন্দেহ কি। তাই বলে, ধর্মান্তর গ্রহণ করেছ বলে দেশের বিধবাদের তুমি হেনস্তা করবে? যা নয় তাই বলে

দেখাবে ? বোস্টনে একটা রমাবাঈ-সার্কল ছিল, স্বামীজি সেখানে বক্তৃতা দিতে গেলেন।

আমেরিকায় সেই তাঁর প্রথম বক্তৃতা।

বিষয়, ভারতীয় নারী—তথা বালবিধবা।

আমেরিকার মেয়েরা যারা শুনতে এসেছিল তারা থমকে গেল। ভারতে নরীত্ব স্ত্রীত্ব নয়—ভারতে নারীত্ব মাতৃত্ব।

এমন সব শুভ্র পবিত্র উজ্জ্বল কথা বললেন স্বামীজি যা রমাবাঈ বলেনি। এমন ছবি তুলে ধরলেন যা কলঙ্কের ঊর্ধ্বে চন্দ্রিকার মত।

তারপর একদিন মিস স্যানবর্ণ স্বামীজিকে নিয়ে গেলেন শেরবর্ণ মহিলা জেলখানায়।

মাথায় হলদে পাগড়ি গায়ে জ্বলন্ত গেরুয়া, বিষাদধূসর বন্দীশালায় সর্বকাল-প্রসাদ বিবস্বান সূর্যের মত আবির্ভূত হলেন স্বামীজি। সর্ববন্ধন বিমোচন ও সর্বব্যাধি-নির্মুক্তির আশ্বাস নিয়ে। কয়েদীর দল বহুমঙ্গল সন্ন্যাসীকে দেখে উল্লাস করে উঠল। তিনি যেন রুগ্নের আরোগ্য—দরিদ্রের বৃহৎনিধি।

সেখানেও ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রা নিয়ে বক্তৃতা করলেন স্বামীজি।

দণ্ড যে প্রতিশোধের জন্যে নয় সংশোধনের জন্যে এই নতুন তত্ত্ব দেখলেন এই জেলখানায়। যারা পাপী আর পতিত তাদেরকে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে নয় তাদেরকে টেনে তুলে নেবার জন্যেই এই আশ্চর্য কর্মমন্দির। তারা যে পশু নয় ক্রীত-দাস নয় গৃহহীন ভিক্ষুক নয় এই বিশ্বাসে তারা বলীয়ান।

'যখন ভারতবর্ষের দরিদ্র ও পতিতের কথা ভাবি,' লিখছেন স্বামীজি, 'তখন ব্যথায় বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। তাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই, ওঠবার উপায় নেই, রাস্তা নেই পালাবার। তারা ডুবে যাচ্ছে দিন দিন। তারাও যে মানুষ এ কথাটাই তাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হচ্ছে প্রাণপণে। হিন্দুধর্মের দোষ কি। হিন্দুধর্ম তো শেখাচ্ছে যেখানে যত প্রাণী সবাই তোমার আত্মার প্রতিরূপ মাত্র। দোষ ধর্মের নয়, দোষ হৃদয়ের অভাব। প্রভু এসেছিলেন বুদ্ধ হয়ে, গরিবের জন্যে দুঃখীর জন্যে পাপীর জন্যে কত কেঁদে গেলেন, কত শেখালেন কাঁদতে, কেউ তাঁর কথায় কান

দিলে না। কিন্তু নিরাশ হয়োনা। প্রভু আবার আমাদের ডেকেছেন, কোমর বাঁধো, সমুচ্চ পতাকা তুলে নাও দৃঢ়করে।'

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক সাহিত্যের ডক্টর, অধ্যাপক জন হেনরি রাইট শুনতে পেয়েছেন স্বামীজির কথা। স্যানবর্ণদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের, মিস কেটই পরিচয় করিয়া দিলেন। কিন্তু কি বৃহত্তেজ ব্যক্তিত্ব স্বামীজির, কথা কিছুতেই শেষ হতে চায়না। রাইট ভাবলেন একদিন তাঁর নিজের বাড়িতে স্বামীজিকে নিয়ে গেলে কেমন হয়!

যে কাছে এসে দেখে, কথা কয়, সেই জয় গায়। কেট স্যানবর্ণের খুড়তুতো ভাই ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন—তারও কানে উঠেছে এই অদ্ভুতদর্শন হিন্দু সাধুর কথা। বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেতে চাইছিল কিন্তু কাছে বসে কথা কইতে এসেই মজে গেল। যে সে লোক নয় ফ্রঙ্কলিন, সংবাদপত্রী, দার্শনিক, সমাজসেবক। ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে, বোস্টনে।

রাইট এসেছেন বোস্টনে, স্বামীজির খোঁজে। কোথাও দুজনে বেরিয়ে গিয়েছে হয়তো, ধরতে পেলেন না। চিঠি লিখে রেখে গেলেন: স্বামীজি, যদি দয়া করে আসেন আমার ওখানে, সমুদ্রের ধারে আনিসকোয়াম গ্রামে, যদি আমাদের সঙ্গে কাটান একটা উইক-এণ্ড।

এক শুক্রবার এসে হাজির হলেন স্বামীজি। গৈরিকের সৈনিক, দিব্যদীপ্তিতে সহস্রাংশু। যেন স্বপ্নের মূর্তিতে জাগ্রত সত্য এসে দাঁড়ালেন। সমস্ত গাঁ-শহর আলো হয়ে গেল। হুল্লোড় পড়ে গেল চারদিকে। বাড়ি-ঘর-হোটেল-দোকান ভেঙে পড়ল দলে-দলে।

ত্রিশ বছরের যুবক, দেখ কি মহিমা তার আকৃতিতে। দেখ কি গৌরবে বহন করছে তার দেহ। দেহ তো নয় ঊর্ধ্ব-উচ্ছ্রিত স্তব। অব্যাহতবল বিগ্রহ। বিপুলাংস, মহাবাহু, কম্বুগ্রীব, বিশালাক্ষ। স্নিগ্ধবর্ণ, সর্বশুভলক্ষণ, নিত্যনির্মলাত্মা। চলো দেখবে চলো। আছে কোথায়? হোটেলে-মেসে নয়, গাছতলায় নয়, ডক্টর রাইটের বাড়িতে। পণ্ডিত চিনেছে এবার পণ্ডিতকে: সারাক্ষণ কি কথা কইছে হে? শুধু ধর্মের কথা। প্রতি নিশ্বাসে প্রত্যেকটি চক্ষুর পলকে ধর্ম। ধর্মই আলো ধর্মই বাতাস ধর্মই জল ধর্মই খাদ্য।

উনি বলছেন আর সবাই তাই শুনছে স্থির হয়ে? সায় দিচ্ছে? তর্ক করছে না?

অনর্গল তর্ক করছে। কিন্তু সাধ্য নেই তাঁকে তুমি পরাস্ত কর। পরাস্ত করা দূরের কথা সাধ্য নেই তাঁকে তুমি ফেল বেকায়দায়।

সেই শুদ্ধ জ্ঞানের দক্ষিণামূর্তির কাছে সমস্ত তর্ক স্তব্ধ। তুমিও বসে পড়ো সামনে। তারপরে শোনো উৎকর্ণ হয়ে।

একদিন রাইট স্বামীজিকে গির্জেতে নিয়ে গেলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই শুনল তাঁর দীপ্তবাণী। যাকে সবাই মূর্তিপূজক বলে চেয়েছিল দূরে রাখতে, তাকেই এখন হৃদয়ে এনে বসাল ধ্যানের মূর্তি করে।

'জগতের সমগ্র জাতিকে বলতে হবে বেদের ভাষায়, তোমাদের বাদবিসম্বাদ বৃথা। তোমরা যে ঈশ্বরকে প্রচার করতে চাও তাকে কি দেখেছ কখনো? যদি না দেখে থাকো,. প্রচার নিরর্থক, তুমি কি বলছ তাই তোমার জানা নেই। আর যদি তুমি ঈশ্বরকে দেখে থাকো, আর কিসের তবে বিবাদবচসা? তোমার মুখ তখন অন্য শ্রী ধারণ করবে। জীবনে তাই শ্রীমান হয়ে ওঠো। এক ঋষি তার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্যে পাঠিয়েছিল গুরুগৃহে। শিক্ষা সমাপ্ত করে পুত্র যখন ফিরে এল ঋষি জিগগেস করলে, কি শিখলে? নানা বিদ্যা নানা বাক্য নানা বেদ। কিছু হয় নি। আবার যাও গুরুগৃহে। আবার যখন ফিরল আবার সেই বাগাড়ম্বরের স্পর্ধা। এবারও হয়নি, আরেকবার চেষ্টা করো। তৃতীয়বার যখন ফিরল পুত্র, তখন তার আর কথা নেই, তখন তার শুধু বিভা, তার শুধু শ্রী। তখন ঋষি বললেন, বৎস, তোমার মুখ আজ উদ্ভাসিত দেখছি, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। যখন কেউ ঈশ্বরকে জানবে তখন তার মুখশ্রী তার স্বর তার দৃষ্টি তার ভঙ্গি তার সমগ্র আকৃতিই বদলে যাবে। তখন সে মানুষের মহামঙ্গলস্বরূপ হয়ে উঠবে। তখনই সে ঋষি নামের অধিকারী হবে। ঋষিত্বলাভই হিন্দুর মুক্তি।'

এ কি সেই হিন্দু নয়? এ কি নয় সেই ঋষি? (ক্রমশঃ)

কুরুক্ষেত্র

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

ইচ্ছাটা আমার অনেক দিন থেকেই ছিল। নানান ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে—ছবি-ছাবা দেখে মনটা প্রায়ই উধাও হয়ে যেতো। মাঝে মাঝে নীল আকাশের নীচে—ময়ূরাক্ষীর বালিচরে বসে স্বপ্ন দেখতাম—ধূ ধূ মরুভূমির ধারে বসে আছি। 'থর' মরুভূমির বুক চিরে রেললাইন চলে গেছে—কোথাও লোকালয় নেই, ধূ ধূ বালি আর বালি। বাতাসে ঝুনঝুন করে বাজছে। না হয় কোন সমুদ্রের ধারে বসে আছি, পায়ের কাছে ইয়া সঙ্গিন ঢেউগুলো এসে ছিত্‌রে পড়ছে; ফেনায় ফেনায় ভরে উঠছে মাটি। হিমালয়ের কোলে হরিদ্বার শহরে এসে পড়েছে পড়ন্ত সূর্যের আভা, গঙ্গার কাচ-ধার জলে সাতার দিয়ে বেড়ায় মহাশোল মাছগুলো—হরহর ধ্বনি উঠছে চারিদিকে।

—এ্যাই!···হঠাৎ ডাক শুনে চমকে উঠলাম। দেখি নাপিতদের ন্যাড়া; অধিকারীবাগান থেকে চুরি করে পাড়া পেয়ারায় কামড় দিতে দিতে বলে—একটা টাকা দিতে পারিস?

—টাকা! সর্বাঙ্গ জলে যায় আমার। এতক্ষণে কোথায় পুরী-কাশী-হরিদ্বারের স্বপ্ন দেখছিলাম—উনি এলেন টাকা চাইতে! জবাব দিই—টাকা! চাট্টে পয়সার জন্য সিদিন মায়ের কাছে কত বকুনি খেলাম!

ন্যাড়া একটু হতাশ হয়ে পেয়ারাটায় মোক্ষম কামড় দিয়ে বলে—ধ্যাৎ, একটা চিমটে হতো রে; গুপীকামার তৈরী করে রেখেছিল জটাধারী বাবজীর জন্যে; সে ব্যাটা নেবেনা। আমাকে তাই বল্লে—

—ন্যাড়া প্রায়ই বলে মামা-মামীর গালমন্দ বকুনি খড়োই পরোয়া করে সে, সন্ন্যেসী হয়ে চলে যাবে তীর্থে তীর্থে।

—কাশী হরিদ্বার প্রয়াগ সব যেতে হবে তাহলে! যাবি তো? শুধালাম তাকে।

ন্যাড়া বুকটান করে পদ্মাসন হয়ে বসেছে বালুচরে আকন্দতলায়। ইতিমধ্যেই তপজপ আসন সে শিখছে। আমার কথায় বলে ওঠে—আলবৎ; প্রয়াগে গিয়ে তো মাথা মুড়োতে হবে। তবেই দীক্ষা।

'প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা
যা রে সাধু যথা তথা।'

কিৎসু জানিস না তুই। আরে বই পড়লে শেখা যায় না। দেশভ্রমণ করতে হবে—বুঝলি?

ন্যাড়ার জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হই। স্কুলের দিক মাড়ায় না—গাঁয়ে সাধু এলেই সেইখানে গিয়ে

জোড়হাত করে বসে থাকে ; বালেশ্বরের সাধুবাবা তো ন্যাড়াকে আশীর্বাদ করে গেছেন—ভক্তি হোক তোর।

ইতিমধ্যে ন্যাড়া সাধুদের মত একটা বিদ্যেও রপ্ত করে ফেলেছে। কেদেরদিঘীতে মহাদেবের পাট ডুবোনো থাকে। গাজনের দিন শিবভক্ত সেই কাঁটা-ওঠানো পাটে চিৎ হয়ে শোয়, পিঠের নীচে অনেক কাঁটাপেরেক তোলা—ন্যাড়া ডুবে ডুবে সেই জাগ্রত পাটকে তুলে কেয়া ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, আমাকে দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেয়। ন্যাড়া চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে জাগ্রত পাটের উপর।

—হ্যাঁ রে, এ যে মহাদেবের পাট !

—হোক না, আমিও তো সন্ন্যেসী হবো। একদিনের সন্ন্যেসী নয় বুঝলি—পাকা সাধুবাবা।

ডাকাবুকো ছেলেটা সব পারে ; পাটটাকে আবার কেয়া ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে দেয়—সাপের আস্তানা ওই ঝোঁপে ওর কোন ভয়ডর নেই।

—তা দিবি একটা টাকা ?

—কবে বেরুবি ?

তোড়জোড় করাই আছে। তা তুই কি পারবি যেতে ? ওই মিন্‌মিনে্ গলা—বাটকারার গুটকে শরীর—পারবি সইতে এই ধকল ?—তবে দেশ দেখা তো হবে।

আমিও তৈরী হয়ে আছি। বহু কষ্টের সঞ্চয় পনের টাকার থেকে ন্যাড়াকে একটা টাকা হাতছাড়া করলাম।

—দে দিকিন আরও গণ্ডাকতক পয়সা ; গেরুয়া রং কিনতে হবে—দু'এক আনার সিদ্ধিও চাই। রাত-ভোরেই বেরুতে হবে কিন্তু—কাক-কোকিল ডাকবার আগেই।

পায়ে হেঁটে তিন কোশ পথ, তারপর বাসে চেপে আঠার মাইল গেলে ইষ্টিশান। সেখানে পৌঁছতে পারলে আর ভাবনা নেই। গেরুয়া পরলে ট্রেনের চেকারও নাকি প্রণাম করে বসবার জায়গা করে দেয়, টিকিট চাইবে কি—উলটে চা খাওয়াবে গাঁটের পয়সা খরচা করে।

মুখ-আঁধারি ভোর। পথের আনন্দে বুক কাঁপছে দুরুদুরু। ন্যাড়া গম্ভীরভাবে আগে আগে চলেছে, পিছনে পুঁটুলি বগলে আমি। জামা প্যান্ট গেরুয়া কিছু নগদ টাকা, চিড়ে-গুড় ওতেই বাঁধা। ন্যাড়ার হাতে সেই ঝকঝকে চিমটে, লোটা-কম্বল পিঠের সঙ্গে বাঁধা।

—ঝুন ঝুন ঝনাৎ। ঝুন ঝুন ঝনাৎ।

—কেমন শব্দ শুনেছিস, তেজী সন্ন্যাসীর চিমটে, গুপে তৈরী করেছে ভালো।

আমার মনে একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠছে।...

—হ্যা রে, কুরুক্ষেত্র যাবি তো? ভীমের গদা দু'একটা তীর-ধনুক যদি পাওয়া যায় নিয়ে আসতে হবে। সেদিন পটলা বলছিল—ওসব শ্রেফ্ বাজে কথা।

ন্যাড়া থামিয়ে দেয় আমাকে—চুপ কর। কুরুক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র করিস নি—শেষকালে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।—কে আসছে মনে হচ্ছে না?—থমকে দাঁড়িয়েছে ন্যাড়া—

চারিদিক দেখে বলি—কই না তো?

—না রে, কালীসাধনা, সন্ন্যাসী হওয়া এসব শুভ কাজে মা কালী নানা মূর্তি ধরে এসে বাধা দেয় বুঝলি। ওঁর জারিজুরী যে ফাঁস হয়ে যাবে। হুঁ হুঁ বাবা, এসব ভেল্কী, মায়া। সন্ন্যাসীর কাছে ওসব ট্যা-ফু চলবে না কিনা তাই বাধা দেবেই।

ওসব কথা আগে শুনিনি—ভেল্কি বাজী! ও যে কেশরপাড়ের মেলায় আসে চার পয়সার টিকিট।

—ধ্যাৎ! ন্যাড়া থামিয়ে দিয়ে হন্ হন্ করে চলতে থাকে।

শহরের কাছাকাছি এসে সকাল হয়।...লোকজন তখনও পথে দেখা দেয়নি; দূরে শহরের শাদা বাড়ী দেখা যায়। হঠাৎ ঝনাৎ করে চিমটে টা ফেলে দিয়ে ন্যাড়া রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে দৌড়চ্ছে দেখে অবাক হয়ে যাই। টং টং করছে লোটা আর কম্বলের বোঝা। আল পগার টপ্‌কে ন্যাড়া দৌড়চ্ছে একটা শিয়ালের পিছনে।—হৈ-উলো হৈ!...উলো হৈ। শিয়ালও এক একবার পিছন দিকে চায়, আবার দৌড়য়; রাস্তা পার হয়ে সটান উজিয়ে পালাল শিয়াল।

ন্যাড়া রাস্তায় উঠে হাঁপাচ্ছে হাঁসফাঁস করে।

—কি হল রে?

—চল, যাত্রা শুভ করে এলাম। কথায় বলে বাঁ-শিয়াল। দেখলি না ডাইনের শিয়ালকে বাঁয়ে তাড়িয়ে এনে যাত্রা বদলালাম। জয় গুরু—কালীকরালবদনী মা।

ঝুন ঝুন ঝনাৎ! আবার চিমটে-বাদ্যির সঙ্গে যাত্রা সুরু হল।

লোকজন জেগে উঠেছে শহরে। ন্যাড়ার অপরূপ মূর্তি হয়েছে। ফেরতা দিয়ে কাপড় পরা, একটা গামছার এক দিকে বাঁধা ভাজ করা কম্বল—পিঠের একদিকে ঝুলছে টং টং শব্দে শূন্য একটা ঘটি; আর হাতে ঝকঝকে চিমটে বাজছে—ঝুন ঝুন ঝনাৎ।

পিছনে চলেছি আমি—এতখানি পথ হেঁটে হাঁপিয়ে উঠেছি, ঘাড়ের পুটুলিটা নেহাৎ কম নয়; এ-কাঁধ ও-কাঁধ করে নিয়ে চলেছি।

—এই ন্যাড়া, একবার নেনা এটা।

—ধাৎ, সাধুবাবা পুটুলি বইবে কি রে? চ্যালা থাকে কেন? নিয়ে চল একটু, দূরেই মটর অপিস—এসে গেছি।

সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে—আমার টাকায় কেনা চিমটে, আমার বহুকষ্টের জমানো পয়সায় ওর গেরুয়া ছাপান; জামাটা পর্যন্ত আমার। একটু পুটুলি বয়ে নিয়ে যেতেই এত বড় কথা! গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি, তবুও কোন রকমে টেনে নিয়ে চলি।

ন্যাড়ার ভোগ্‌লুমি ভণ্ডামী আছে। সটান মটর অপিসে গিয়ে বাসে ওঠ—তা নয়, ও গিয়ে অপিসের সামনের অশথতলায় ডেরা নিল। ঝার কতক ব্যোম ব্যোম ডাক তুলে মাথান দিয়ে চিমটে গেড়ে বসল সাধু।

—শেষকালে ফেঁসে পড়বি ন্যাড়া। চেনা লোক কেউ বেরিয়ে পড়লে বিপদ হবে। চল এই মটরেই কেটে পড়ি। দূরে গিয়ে ডেরা নিবি।

—চিনলে কি হবে? চুরি করিনি তো। ভাবনা কিসের। তুই টপ্ করে দু'ভাঁড় চা, না-না, ঘটিটা নিয়ে যা—কল থেকে জল নিয়ে—চা আনবি।

—পয়সা? বলে উঠি।

ফ্যাট করে ওঠে ন্যাড়া—হাড়কেপ্পন তুই। ব্যবসা থেকে রোজগার করতে গেলে টাকা ঢালতে হয় আগে। খাইয়ে-দাইয়ে রাখ, দেখবি দু'হাতে টাকা কামাব। অঢেল টাকা। ঘোর না কত ঘুরবি হিল্লি-দিল্লি। নে চা আন, গরম পেয়াজি পেলে লুকিয়ে পকেটে পুরে আনবি, বুঝলি—

হাড়পিত্তি জ্বলে উঠছে সাতসকালেই। তিন কোশ পথ ওর মোট বয়ে এনেছি। একবারও কাঁধ লাগায় নি। টাকা দিয়ে ওকে চিমটে বানিয়ে দিয়েছি—নগদ দশগণ্ডা পয়সা আরও দিয়েছি। তারপর চাকরের মত জল চা ইত্যাদি আন্ নিজের পয়সা খরচ করে!

—এই শেষবারের মত আনছি কিন্তু। এরপর আর খরচ করতে পারবো না। এখনও সব দেখা বাকী, কাশী হরিদ্বার কুরুক্ষেত্র কিছুই দেখা হ'ল না।

আবার কুরুক্ষেত্তর! তুই ভাবিস নি দেখ ভেল্কী লাগিয়ে দোব।

চা-পেয়াজি খেয়ে ন্যাড়া বলে—কাল সকালের মটরে যাবো। তার মধ্যে দু'চার পয়সা আমদানী করে দোব—তুই এদিক-ওদিক একটু ঘুরে আয়।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত শহর জেগে উঠেছে। বাজারে গাড়ী গাড়ী তরকারী, ধান চাল আমদানী সুরু হয়েছে, অবাক হয়ে তাই দেখছি কাছারীর বারান্দায় বট অশ্বত্থ গাছের নীচে উকিল মক্কেলের দল হৈ চৈ করছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও কিছু হয়নি। দেশ দেখার প্রথম আনন্দে বেশ মশগুল হয়ে আছি।

মটর অপিসের ওপাশে বটতলায় দেখি দু' চারজন লোক জমা হয়েছে। ন্যাড়াকে চেনবার উপায় নেই। মাথা নীচু করে পা দুটো ভাঁজ করে উপরে তুলে ঠায় ধ্যানস্থ হয়ে আছে। ছাই মাখা, গা কপালে একতাল মেটে সিন্দুর। সামনের গামছায় বেশ কিছু পয়সাও পড়েছে—ও পাশে কে বালক ব্রহ্মচারীকে নামিয়ে দিয়ে গেছে কয়েকটা আম-বেল-কলা, আতপ চাল ইত্যাদি। তা কুল্যে ন্যাড়া রোজগার করেছে মন্দ নয়।

মামার হাতে জটা পরচুলাটা বাস থেকে গেল—পড়ে রইল ত্রিশূল-চিমটে-কম্বল আর লোটা—ন্যাড়া মারলে চোঁচা দৌড়।

হঠাৎ এই দিকে ন্যাড়ার মামাকে এগিয়ে আসতে দেখে চমকে উঠি। গাঁজাখোর লোক, নেশার ঘোরে চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। সকাল বেলাতেই বাড়ীতে না দেখে বোধহয় খুঁজতে বের হয়েছে।

ফিস্‌ফিস্ করে বলি—ন্যাড়া!

গম্ভীর গলায় ন্যাড়া বলে—কল্যাণ হোক।

নিকুচি করেছে তোর কল্যাণের; পুটুলিতে আমার চৌদ্দ টাকা—জামা-কাপড় আছে, আর ওই চিমটে এক টাকা; সব গুটিয়ে নিয়ে পালাব কিনা ভাবছি, অতর্কিতে এসে ন্যাড়ার মামা গর্জন করে ওঠে—এ্যাই ন্যাড়া!

সাধুবাবার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়; তড়াক করে লাফ দিয়ে আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দেবার আগেই ওর চুলের জটা সমেত মাথাটা ধরে ফেলে। ন্যাড়াও মরীয়া হয়ে হেঁচকা টানে মাথাটা গলিয়ে নিয়ে চোঁচা দৌড়। মামার হাতে জটা পরচুলাটা বাস থেকে গেল—পড়ে রইল ত্রিশূল-চিমটে-কম্বল-লোটা আর আমি পুঁটুলিসমেত। মামাও নাছোড়বান্দা—দৌড়ে গিয়ে ভাগ্নেকে ধরে আনল।

—চিমটেটা আমার।

মামার আগেই আমি দখল নিয়েছি নোতুন চিমটেখানার। মামা গর্জন করছে—চল্ বাড়ী।

লোকজন জমে গেছে। মটরের যাত্রীদল—লোকজন বিনা খরচায় এমন মজা দেখবে ভাবতে

পারেনি। কে সদুপদেশ দেয়: দেন না আচ্ছাসে আড়ং ধোলাই—ঢিট হয়ে যাবে। আজ কালকার ছেলেদের সাহস দেখুন দিকি।

কে বলে ওঠে পরীক্ষায় ফেল করেছো নাকি খোকা?

—ডেঁপো ছোকরা। দে না চাঁটিয়ে লাল করে।

ইত্যাদি নানা মধুর মধুর সম্ভাষণ শুনতে শুনতে বের হয়ে এলাম। ঝুনঝুন করে বাজছে চিমটে। ওই বাদ্যিই ভোর রাতে কত মিষ্টি লাগছিল—এখন গা জ্বলে ওঠে।

ন্যাড়ার মামা তিন কোশ পথ ন্যাড়াকে নিয়ে গেল ঠিক যে ভাবে হাফব্যাক 'ক্যারি' করে গোলের দিকে বল নিয়ে চলে সেই ভাবে। একটা করে মোলায়েম কিক্ করে আর বলটা খানিকটা গড়িয়ে যায়—আগে আগে। ন্যাড়াকে ফুটবল ভেবেছে ওর মামা। মাঝে মাঝে আমার দিকে গজগজ করে চাইছে যেন কাগজিলেবু-চোষা করে চুষে ফেলবে এইবার হাফ-টাইমে। গর্জাচ্ছে: কুরুক্ষেত্ত—দেখবি চল কুরুক্ষেত্তর কাকে বলে!

পথেই এই কাণ্ড—বাড়ী ফিরে এসে যা অবস্থা হয়েছিল তা আর নিজের মুখে বলি কি করে। ওটা ভেবে নিও। তবে তাতেই কুরুক্ষেত্রের কিছুটা নমুনা পেয়েছিলাম।

সেই চিমটেখানা এখনও ঘরের এককোণে পড়ে আছে—ভোজটোজের সময় উনুন ঝাড়া চলে—মাঝে মাঝে ছাদ থেকে ওরই ঝুন-ঝুন শব্দে বাঁদর তড়াই।

শালিক শালিক

শ্রীপলাশ মিত্র

শালিক শালিক শালিকটি
ঘোম্‌টা মাথায় দিয়ে
ফুল গুঁজেছে এলো চুলে
আজ যে তারি বিয়ে।
গয়না নিয়ে ময়না আসে
হলুদ মেখে বাবুই হাসে
বরের পিসী চড়ুই এল
পান-সুপারি নিয়ে
শালিকরাণীর বিয়ে।

শালিক শালিক শালিকটি
ঘোম্‌টা মাথায় দিয়ে
ইকিড় মিকিড় করবে খেলা
শ্বশুর বাড়ি গিয়ে।
ঘুঙুর পায়ে নাচবে দিনে
বাপের বাড়ি আসবে চিনে
চকোলেট আর লজেন্স নিয়ে
সঙ্গে যাবে টিয়ে
শালিকরাণীর বিয়ে॥

তোমরাও এমনি হ'তে পারো

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ

তোমরা লেখাপড়া শিখছ। যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করি, "কেন এই লেখাপড়ার আয়োজন?" মনে হয় অনেকেই শোনাবে কবিতার সেই দুটি লাইন—

"লেখাপড়া করে যে
গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সে।"

সত্যিই কি তাই? আসল লেখাপড়ার আয়োজন কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে নয়। তা কেবল জিনিষ জড় করবার বিদ্যা আয়ত্ত করা নয়। তবে লেখাপড়ার বা শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয় বহুবার তোমাদের কানে গিয়ে থাকবে। গুরুজনরা যখন আশীর্বাদ করেন, তখন কি বলেন? "লেখাপড়া শেখো, মানুষ হও।" মানুষ হওয়াটাই বড়। সেটাই বড় কাজ ও শক্ত কাজ। কতকগুলো বই পড়ে পরীক্ষায় পাশ করলেই লেখাপড়া শেখা হয় না। লেখাপড়া করে গাড়ী চড়লেই মানুষ হওয়া যায় না। মানুষের মতন মানুষ তাই জগতে দুর্লভ। পণ্ডিত হওয়া এক কথা, আর মানুষ হওয়া আর এক কথা। তাই প্রকৃত মানুষ ক'জনই বা মানুষের ইতিহাসে দেখা দিয়েছে। হল্যাণ্ডের ইরাসমুস (Erasmus), জার্মানীর গ্যেটে (Goethe), আইনষ্টীন (Einstin), আল্‌সেসের স্বইৎজার (Schweitzer) ইতালীর লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo Da Vinci), ভারতের বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, এঁদের মতন ক্ষণজন্মা পুরুষদের জন্যে আমাদের অনেকদিন ধরেই অপেক্ষা করতে হবে।

মানুষ হওয়ার পথ বড়ই দুর্গম। সে পথ ক্লেশের পথ, ত্যাগের পথ, সংযমের পথ। পনের আনা লোকের তাই নজর টাকার থলির উপর। সেই জন্যেই মানুষের মধ্যে কুবের-পূজা আজ সংক্রামক হ'য়ে দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ এমন কাজ করো যাতে টাকার পুঁটলী মোটা হবে, গাড়ী হবে, বাড়ী হবে, বাগান হবে—সুখের সরঞ্জামের অভাব হবে না। প্রাচুর্যের স্রোতে গা-ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবে। মধু-সন্ধানী মৌমাছির মতন তাই আমরা ছুটছি সুখের সন্ধানে—সুখ পাই না, কেবল শখ মিটিয়ে চলি। সুখের নামে সৌখীন উপাচার সংগ্রহ করি। একটা গল্প বলি শোন:

এক বিরাট ধনী ছিলেন বেলজিয়মে। প্রচুর অর্থ-সম্পত্তি রেখে তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি এক শেষ চিঠি লেখেন। সেটা লেখেন বেলজিয়মের প্রসিদ্ধ দার্শনিক লেখক মরিস মেটারলিঙ্ককে, যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঐ ধনিক ব্যক্তি লিখেছিলেন, "যে

ঐশ্বর্যের অধিকারী আমি ছিলুম, তা একজন মানুষের থাকা উচিত নয়। বৃথাই কাটিয়েছি বছরের পর বছর সুখের সন্ধানে।"···মেটারলিঙ্ক বলেছেন যে, "টাকা দিয়ে যা কিছু পাওয়া যায়, তা সবই ঐ ধনীর ছিল, কিন্তু তাঁর সমস্যার সমাধান করার জন্য যা প্রয়োজন তা কেনা যায় না। সেটা ছিল হয়ত তাঁর নাগালেরই মধ্যে এবং তার জন্য কিছু খরচ করতে হয় না।"

কি সুন্দর পারস্যের সেই পুরাতন গল্পটি। একজন প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে সুখ ছিল না। সুখী হোতে হলে কি করা দরকার জানবার জন্য তিনি তাঁর রাজ্যের জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে গেলেন। অক্লান্ত গবেষণার পর তাঁরা রাজার সমস্যার এক উত্তর খুঁজে বার করলেন। বললেন, "আপনাকে এক সুখী লোকের জামা পরতে হবে।" বহুকাল ধরে চলল খোঁজাখুঁজি। সম্পূর্ণরূপে সুখী এক গরীব চাষাকে পাওয়া গেল। কিন্তু জীর্ণ-শীর্ণ সেই মানুষটির গায়ে কোন জামা ছিল না।

তাই মেটারলিঙ্ক বলছেন, "জীবনের অনেক সুখ ও অনেক দুর্ঘটনাই দৈবাধীন, কিন্তু আমাদের অন্তরের শান্তি দৈবের শাসনের বাহিরে অবশ্য আমি তা বলতে চাই না যে, সব মানুষই বাইরের জিনিষ পেয়ে সুখী হতে পারে। বাইরের অবস্থা অনেক কিছুই করতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম ভাগ্যবান যিনি, তিনিও শান্ত ন্যায়বান ও উদার হয়ে আন্তরিক জীবনকে সুখময় করতে পারেন। তাঁর অন্তরে থাকবে না হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য এবং ব্যর্থতার খেদ; এই রকম অনাবিল অন্তরের দৃষ্টিতে দেখতে শিখতে হবে সকল জনকে। এই হলো প্রকৃত সুখের পথ।"

শান্ত, ন্যায়পরায়ণ, উদার হিংসা-দ্বেষ হীন হওয়াই প্রকৃত মানসিক সুখলাভের যোগ্যতা অর্জন করা। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল চাই কাজ। এমন কাজ করতে হবে যে, যে কাজ করবে এবং আর যার জন্য করবে, তারা উভয়েই হবে ধন্য। আজকের পৃথিবীর সেরা মানুষ আর্লবার্ট সুইৎজার এই কাজের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, এটার নাম হল, 'আমার দ্বিতীয় কাজ'। অদ্ভুত মানুষ এই সুইৎজার। বয়স এখন ৮৩ বছরের কাছাকাছি। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, দর্শন-শাস্ত্র, সঙ্গীত-শাস্ত্র, ধর্ম-শাস্ত্র, চিকিৎসা-শাস্ত্র—চার-চারটি শাস্ত্রে ডক্টর উপাধি পেয়েছেন, সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর খ্যাতি। খ্যাতি শুধু তাঁর জ্ঞানের নয়, খ্যাতি তাঁর সেবার ও আত্মত্যাগের। লেখাপড়া তিনি শিখেছিলেন গাড়ী-ঘোড়া চড়বার জন্য নয়, আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মূর্খ, দরিদ্র কালো নিগ্রোদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার জন্য। তাই তিনি আজ ৪৫ বৎসর ধরে এই অক্লান্ত সেবায় আত্মনিয়োগ করে চলেছেন।

প্রায় চার পাঁচ বছর আগে তিনি যান আমেরিকায়। ধন-কুবেরের দেশের লোকেরা চাইল তাঁর কাছে বাণী। তখন তিনি 'তোমার দ্বিতীয় কাজ' নামক তাঁর এই বাণী শোনান—

—"মনের এই পেশার কথাকেই আমি বলি 'তোমার দ্বিতীয় কাজ'। এ কাজ করার সুযোগ লাভ করা ছাড়া এতে আর কোনো পাওনা নেই। এ কাজই এনে দেবে তোমাকে মহৎ সুযোগ, আর এতেই পাবে তুমি অসীম শক্তি। তোমার ভিতরকার যে সকল শক্তি এখনও কোনো কাজে লাগেনি, সেই সকল শক্তিকে নিয়োগ করতে পারা যাবে। অন্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, এমন সব লোকেরই আজ পৃথিবীতে অভাব। স্বার্থলেশহীন এই শ্রমের জন্য উপকারী ও উপকৃত উভয়ের উপরেই আসে আশীর্বাদ।" তিনি আরও বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমরা মস্ত ভুল করি এই যে, জীবনে আমরা চোখ বুজে চলি, আমাদের কাজ করবার সুযোগগুলি লক্ষ্য করি না। আমরা আমাদের চোখ খুলে যখনই খুঁজতে আরম্ভ করি, তখনই দেখতে পাই বহু লোককে যাদের জন্যে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে—বড় ব্যাপারে নয়, অতি সামান্য ছোট ছোট কাজের জন্যে। মানুষ যেদিকেই চোখ ফেরাক সে একজন না একজনকে দেখতে পাবে, যে তার সাহায্য চায়।"

সুইৎজার তাঁর অভিজ্ঞতার একটি কাহিনীও ঐখানে শোনান। তিনি বলেন: "তিনি জার্মানীতে রেলের এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করছিলেন (তিনি তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া চড়েন না, আমাদের গান্ধীজী যেমন করতেন)। তাঁরই পাশে বসেছিল একটি উৎসুক যুবক, কি-যেন-কোন অচেনা জিনিষ খোঁজার ভাব নিয়ে। তারই অপর দিকে বসেছিল উদ্বিগ্ন ও চিন্তান্বিত এক বৃদ্ধ। তখনই ছেলেটি বলে উঠল যে, 'আমরা কাছের সবচেয়ে বড় শহরে পৌঁছবার আগেই অন্ধকার হয়ে যাবে।"

বৃদ্ধটি চিন্তিত ভাবে বললেন—"জানি না সেখানে পৌঁছে আমি কি করব! আমার একমাত্র ছেলে হাসপাতালে পীড়িত হয়ে পড়ে আছে। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে আসতে বলে এক টেলিগ্রাম করেছিল। তার মৃত্যুর আগে আমায় তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আমি গ্রামের লোক, ভয় হয় শহরে পথ হারিয়ে ফেলবো।"

এই কথার উত্তরে ছেলেটি বললে—"আমি এই শহর ভাল করে চিনি। আমি এখানে নেমে, আপনাকে আপনার ছেলের কাছে পৌঁছে দিয়ে পরের গাড়ীতে চলে যাব।"

কামরা ছেড়ে তারা যখন নেমে গেল মনে হল যেন তারা দু'জন পরম আত্মীয়।

এই সামান্য সৎকাজের মূল্য কে নির্ধারণ করতে পারে? সজাগ থেকে তোমরাও তো এইসব ছোট ছোট কাজ করতে পারো।"...

তারপর তিনি আরও বললেন, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে লণ্ডনের ঘোড়ার গাড়ীর এক বৃদ্ধ কোচোয়ানের সৈন্যদলে যোগদানের বিফল চেষ্টার কথা। ঘটনাটি হচ্ছে—"সেই বৃদ্ধ সৈন্যদলের বিভিন্ন নিয়োগ-কেন্দ্রে ব্যর্থমনোরথ হয়ে, নিজেই এক কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিল। শহরের

বাহিরের ক্যাম্প থেকে রণাঙ্গনে যাবার আগে তারা যে ছুটি পেত, সেই ছুটি উপভোগ করতে অনেক সৈন্যই লণ্ডনে আসত। প্রতিদিন রাত্রি আটটায় সেই বৃদ্ধ কোচোয়ান গাড়ী নিয়ে রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত থেকে দিক্-ভ্রান্ত সৈন্যদের সাহায্য করতে লেগে গেল। সৈন্যদল ভেঙ্গে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে প্রতি রাত্রে চার-পাঁচবার লণ্ডনের গোলক-ধাঁধার মতন রাস্তায় পথ-প্রদর্শক স্বেচ্ছাসেবকের কাজে লেগে গিয়েছিল।

অন্যে কি মনে করবে এই আশঙ্কাতেই না আমরা কত সৎ ইচ্ছা কার্যকরী করবার সাহস পাইনা। বড় বড় শহরের ভিড়েই মানুষ বেশী একা-একা বোধ করে। হৃদয়ের দুয়ার খোলা বিশেষ দরকার সেইখানেই। যেখানেই থাক না কেন,—অফিসে, কারখানায়, রেলে, নিজেকে অপরের কাজে লাগাও। কে বলতে পারে, সামান্য একটু হাসির ছোঁয়া, দরদ-ভরা চাউনি মানুষের মনে সূর্যচ্ছটার মত প্রবেশ করে, অন্ধকার দূর করে দিয়ে, তাকে মৃত্যুর হাতছানি থেকে সরিয়ে নিতে না পারে।

যদি সৌভাগ্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়, তুমি মনে কোরো না যে সৌভাগ্যের দান কেবল তোমারই প্রাপ্য। দুঃখ ভোগও যদি করে থাক, এই পণ করো যে সেই দুঃখ থেকে অন্যকে রেহাই দেওয়াই তোমার জীবনের কর্তব্য। কষ্ট করে যে ত্যাগ স্বীকার করা হয়, সেটাই প্রকৃত ত্যাগ। এই ত্যাগ ও পরিহিত ব্রতই তোমার জীবনে এনে দেবে প্রকৃত সুখ।" এই সব কথা মহান্ পুরুষ সুইৎজার বলেছিলেন আমেরিকায়।

তাই কবির কণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তোমরাও এই পণই করো যে—

"নদী যেমন দুই কূলে তার
বিলিয়ে চলে জল।
ফুটিয়ে তোলে তরুলতা
শস্য, ফুল ও ফল।
তেমনি ক'রে মোরাও ভবে
পরের ভালো ক'রব সবে;
মোদের সেবায় উঠবে হেসে
এই ধরণীতল।"

কস্তুরী মৃগ

[উপন্যাস]

দেবাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

একি, এসব কি লেখা। ছড়ার পর ছড়া, শিবানী পড়ে—

এল সেদিন একটা হরিণ
ছোট্ট নদীর ধারে,
সবুজ ঘাসে হয়ে রিলীন
ব্যাঘ্র লেজ নাড়ে।

আরও কত কাটা-কাটা ছড়া, কোনটায় মিল আছে, পড়তে ভাল লাগে, কোনটায় মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন, থাকলেও কানে লাগে। সব কথার অর্থও বোঝা যায় না

এ মা, এ কি ছড়া!

বাদুরদা
ধিনি-ধিনিতা
হাইসো বোলা
কলার খোলা
নাকুর ড্যাং।
নাকুর ড্যাং॥
ডাক্‌লো ব্যাং।
ভাঙলো ঠ্যাং॥
যদু মাষ্টার যমের বাড়ী।
শম্ভু বেদের চাপ দাড়ী॥

নাকুর ড্যাং।
নাকুর ড্যাং॥
ঢাক পেটে লালবিহারী।
ফেরি হাঁকে গলা ছাড়ি॥
নাকুর ড্যাং।
নাকুর ড্যাং॥
মারল ল্যাং।
ভাঙলো ঠ্যাং॥
বল হরি হরি বোল।
হরিবোল হরিবোল॥

* * *

বেলার মাসী।
গুণের রাশি ॥
হেডমিস্ট্রেস বি. এ পাশ।
তাঁহার ছিল কত আশ ॥
স্বামী বটে মহৎ লোক।
মেয়ে কিন্তু ফিঙে জোক ॥

আবার মানচিত্র, বাংলা দেশের। তারপর আবার কত হিজিবিজি লেখা; কোনটা গরুর বিষয় প্রবন্ধ, কোনটা ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধ রচনার ব্যর্থ প্রয়াস! চার লাইন লিখে আর অগ্রসর হতে পারে নি রচয়িতা। আবার ছড়া—

এবার ছড়াটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না শিবানী। পিনাকী লিখেছে—

শিবের বউ শিবানী। ইঁদুর ছিল মেয়েটা।
বুদ্ধি নেই এক আনি ॥ কামড়ে দিল টিয়েটা ॥

শিবানীর ঠোঁটের কোণে হাসি এসে মিলিয়ে যায়। প্রথম লাইনটা মন্দ লাগে নি। শিবের বউ হ'তে কোন্ মেয়েই বা আপত্তি করবে? যদিও বউ কি বস্তু তা ঠিক জানে না শিবানী, তথাপি মায়ের নিত্য শিবপূজার ঘটা দেখে শিবের প্রতি মোটামুটি ভাবে শ্রদ্ধার ভাবই পোষণ করে সে।

কিন্তু পূর্বজন্মে ইঁদুর! এ অপবাদ অসহ্য। শিবানী অনেক ভেবে-চিন্তে ছড়ার নীচে গোটা গোটা অক্ষরে ভোঁতা পেন্সিল দিয়ে লিখলো—

পিনাকী। তেঁতুল গাছের তলে।
চালাকী। ধুঁতরো ফুল গলে।
জোনাকী। নাকুর ড্যাডাং ড্যাং।
মিট মিট জ্বলে। ভাঙ্গুক-তার ঠ্যাং।

আর জোড়া দিয়ে পারে না শিবানী। বানুর ও পিনাকীর প্রবেশে তার প্রতিশোধ-কাব্যে ছেদ পড়ে।

আচমকা পিনাকী এসে পড়বে শিবানী ভাবতে পারে নি। সে একবার বানুরের দিকে তাকায়, আর একবার পিনাকীর দিকে নজর দেয়। তিনজনের মধ্যে কারুরই হঠাৎ বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

অবশেষে বানুর এগিয়ে এসে শিবানীর হাত থেকে খাতাটা টেনে নিয়ে পড়তে সুরু করে।…

পিনাকী চালাকী জোনাকী।

কৈ পিনাকীর মনে তো রাগ হচ্ছে না মোটেই। চালাকী আবার জোনাকী হয় কি করে?

আজকের মেজাজ খুসী, এমনকি ঠ্যাং ভাঙুক এই দুরভিলাষ প্রকাশ করে লিখতে যার পেন্সিলে এতটুকু আঁটকায় নি, তাকেও ক্ষমা করতে আপত্তি নেই পিনাকীর। সত্যিই তো ঠ্যাং ভাঙ্‌ছে না তার। তাছাড়া তিন বছর আগে যেমনটি ছিল, এখন তো আর তেমনটি নেই। শিবানীর রচিত লাইন কয়টির উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নেয় পিনাকী। ভ্রূ কোঁচকায়, কিন্তু শিবানীর বিনুনী ধরে টান দেবার ইচ্ছে নেই আর।

শিবানীর গায়ের রঙ্‌ পিনাকীর মুখের রঙ্‌ থেকেও ফর্সা। গোলাপ ফুলের আভা গালে। টানা টানা চোখে নীল আভা। দীনু মামা বলে, খাঁটি আর্যদের চোখ কটা হয়, নীল আভা দেখা যায়। তবে কি শিবানী খাঁটি আর্যকন্যা? পিনাকীর চোখের মণি অনেকখানি কালো। কালো মানে অনার্য। দমে যায় পিনাকীর মন। অনার্য হলেই বা কি ক্ষতি? ইতিহাসের বইতে আর্যরা যদি অনার্যদের হারিয়ে না দিত বারবার, তাহলে অনার্য হতে পিনাকীর বিশেষ আপত্তি ছিল না। অনার্য হওয়ায় অনেক সুবিধেও আছে। প্রথমতঃ, সব রকমের মাংস খাওয়া চলে। শূয়োরের মাংসেও আপত্তি নেই। মুর্গী খাওয়াও যায়। জিওগ্রাফির মাষ্টার রমানাথবাবু বলেন, জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু মাংস হোল মুর্গীর আর বরাহ অবতারের। আর্য জাতির রঙ্‌ ফর্সা বলেই কি কালো রঙের জন্তু-জানোয়ারের প্রতি ঘৃণাবোধ জেগেছিল? পিনাকা অস্পষ্টভাবে ভেবেছে অনেক, ঠিক ঠিক হদিস করে উঠতে পারে নি।

কেন, এই খাদ্যাখাদ্য বিচার?

পিনাকীর বড় লোভ হয় একবার অন্ততঃ রামপাখীর মাংস রান্না খেয়ে দেখে। বরাহের আস্বাদ না জানি কি উপাদেয়।

বানুর ভাবে, পিনাকী একটা গোটা পেঁপে খেতে চেয়েছিল, মায়ের প্রশ্নে বলে—মা জানো পিনু কেমন কবিতা লিখেছে:

পেঁপে খাও, নাহি দোষ
যত চাও যদু ঘোষ।

সাধনা দেবী হেসে বলেন, এই বুঝি একটা কবিতা হোল? বানুর কবিতা কি বস্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাতে উৎসাহী নয় মোটেই। কথা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে—

—মা, শিবানীর বাবা কি খুব বড়লোক ছিলেন?

—কেন রে?

—শিবানী বললে, তার বাবা মহাপুরুষ। মহাপুরুষ মানে কি মা?

—মহাপুরুষ মানে যিনি মহৎ অর্থাৎ বড় কাজ করেন এবং যে কাজের জন্য দেশের ও দশের কল্যাণ বাড়ে।

—কল্যাণ মানে কি ?

—মানে, মঙ্গল অর্থাৎ ভাল—পৃথিবীর ভাল করেন মহাপুরুষরা।

বাসুর মনোযোগ দিয়ে শোনে, কি যেন ভাবে, গম্ভীর ভাবে বলে—মা, ওমা, শুনছ ?

—কি রে, বল না।

—আমি মহাপুরুষ হব।

—সাধনা দেবী মৃদু হেসে ছেলের দিকে চেয়ে বলেন—বেশ তো, হয়ো। ভাল করে পড়াশুনা কর তা'হলে আজ থেকে।

বাসুরের মুখটা হঠাৎ ম্লান হয়ে যায়, পুনরায় প্রশ্ন করে—আচ্ছা মা, না পড়ে কি মহাপুরুষ হওয়া যায় না ?

সাধনা দেবী এবার কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সুরে উত্তর দেন—যায়, কিন্তু তোমার বেলায় তা চলবে না। একজন মহাপুরুষ বলেছেন চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।

বাসুর মায়ের কথা শেষ করতে না দিয়েই উৎসাহের সঙ্গে বলে—জানো মা, পিনাকী বলছিল, সেদিন ভূদেববাবু ওদের ক্লাশে বলেছেন—রামকৃষ্ণ ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন, তিনি মহাপুরুষ, কিন্তু লেখাপড়া শেখেন নি। কি করে হলেন মা ?

এবার সাধনা দেবী বাসুরকে কোলের উপর টেনে বসান, বুকে জড়িয়ে বলেন—ভগবানকে খুব ভালবাসতে পারলে লেখাপড়া না শিখলেও জ্ঞানী হওয়া যায়।

বাসুর মায়ের স্নেহবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়, উৎসাহের সুরে বলে—আমি মা আর ইস্কুলে যাব না, ভগবানকে খুব ভালবাসব।—মা, ওমা—বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে, খেতে দাও শীগগির।

সাধনা দেবী এক পা পেছিয়ে বাসুরের চোখে চোখ রাখেন। অতিকষ্টে হাসি দমন করে বলেন—ও ছেলে, এই তোমার মহাপুরুষ হওয়া! খিদে পেয়েছে কি রে, এইমাত্র গোটা পেঁপে খেলি! রান্না হোক, তবে তো খেতে দেব।

—ঐ তো খাটের তলায় ঝুড়ির মধ্যে প্রসাদ রয়েছে, দাও না, খাই।

বাসুর মায়ের অনুমতির অপেক্ষা না করেই সুড়ুক করে খাটের তলায় মাথা গলায়, সাধনা দেবী বাধা দিতে না দিতেই একটা আস্ত গজা মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে ততক্ষণে। (ক্রমশঃ)

ভক্ত-হস্তী পারিলেয়ক

শ্রীরেখা চট্টোপাধ্যায়

ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন প্রয়াগের অপর পারে কৌশাম্বী নগরীতে ধর্মপ্রচার করতেছিলেন, সেই সময়ে কৌশাম্বীর নিকটে এক বিরাট অরণ্য ছিল। এখানে একটি বৃদ্ধ হস্তী বাস করিত, তাহার নাম ছিল পারিলেয়ক।

একে পারিলেয়ক বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর অন্যান্য হস্তীদের মত সে স্বজাতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করে না, ইহাতে তাহার শাবকেরা ও সহচরগণ তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। ফলে তাহার জলপানের পূর্বে তাহারা নদীর জল ঘোলা করিয়া রাখিত। বন হইতে পারিলেয়ক কচি কচি ডালপালা ভাঙ্গিয়া আনিলে, তাহারা পাতা ও ডালের নরম অংশ সব খাইয়া ফেলিয়া তাহার জন্য শুধুমাত্র শক্ত ডালগুলা ফেলিয়া রাখিত। এই ভাবে দিনের পর দিন পীড়ন সহ্য করিয়া শেষে একদিন পারিলেয়ক তাহাদের সমস্ত সঙ্গ ছাড়িয়া দূরে গভীর বনের মধ্যে যাইয়া নির্জনে বসবাস করিতে লাগিল।

এই সময় বৌদ্ধ শ্রমণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় ও শেষে নানাবিধ ঝগড়া-বিবাদের পর ভগবান্ বুদ্ধের অজ্ঞাতসারেই তাঁহারা দুইটি পৃথক সঙ্ঘে বিভক্ত হইয়া যান। এই সংবাদ পাইয়া বুদ্ধদেব অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং নিজে এই উভয় সঙ্ঘের কাছে যাইয়া তাহাদের বিশেষভাবে উপদেশ দিয়া বোঝাইতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত উপদেশই মিথ্যা হইল, দারুণ মোহবশে তাঁহারা কেহই বুদ্ধদেবের আদেশ মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন না। ইঁহাদের ব্যবহারে বুদ্ধদেব অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহাদের সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া নিকটের সেই বনে গমন করিলেন, এবং একাকী সেখানে থাকিবার সঙ্কল্প করিয়া ধীরে ধীরে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বন হইতে হিংস্র জীবজন্তু সকল সরিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে পারিলেয়ক ভগবান্ বুদ্ধকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল। সে শালবৃক্ষের শাখা ভঙ্গিয়া সমগ্র স্থানটি পরিষ্কার করিয়া দিল এবং প্রতিদিন নিয়ম মত তাঁহার আশ্রয়স্থল মার্জনা করিতে লাগিল। প্রাতঃকালে হাতমুখ ধুইবার জন্য একটি ভাণ্ড ভরিয়া জল আনিয়া দিত। স্নানের জন্য গরম জলের প্রয়োজন বুঝিলে এক অদ্ভুত উপায়ে পারিলেয়ক সে কাজও সম্পাদন করিত। প্রথমে সে শুঁড় দিয়া কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন জ্বালাইয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বনের শুষ্ক ডালপালা আনিয়া আগুনটি ভাল করিয়া জ্বালাইত। ইহার পরে সেই আগুনের মধ্যে শুঁড়ে করিয়া আনিয়া

পাথরের খণ্ড নিক্ষেপ করিত। এই পাথরের খণ্ডগুলি বেশ গরম হইয়া যাইলে, তখন বংশখণ্ড বা শুঁড় দিয়া এই পাথরের খণ্ডগুলি কোন একটি কূপের জলের মধ্যে ফেলিত। এই ভাবে সমগ্র কূপের জলটিকেই গরম করিয়া ফেলিত এবং নিজের শুঁড় দিয়া জলের উত্তাপ ঠিক হইয়াছে কিনা তাহাও পরীক্ষা করিত।

বুদ্ধদেবের স্নান সমাপ্ত হইলে পারিলেয়ক শুঁড়ে করিয়া একটি ভাণ্ড ভরিয়া পানীয় জল ও বনের সুপক্ক ফলমূল আনিয়া বুদ্ধদেবের সম্মুখে উপস্থিত করিত। বুদ্ধদেব সমগ্র বর্ষাকাল ধরিয়া এই বনে পারিলেয়কের সেবায় স্বচ্ছন্দে কাটাইলেন।

বর্ষা শেষ হইলে নিকটবর্তী গ্রামে তিনি ভিক্ষা করিতে যাইতেন। এই সময় পারিলেয়ক নিয়মিত পাত্রচীর মাথায় করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। বনের শেষপ্রান্তে আসিয়া বুদ্ধদেব তাহার নিকট হইতে পাত্রচীর চাহিয়া লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলে, পারিলেয়ক বুদ্ধের প্রত্যাবর্তনের আশায় সেইখানেই চুপচাপ অপেক্ষা করিত। বুদ্ধদেব ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলে পারিলেয়ক পুনরায় পাত্রচীর মাথায় লইয়া বুদ্ধদেবের অনুগমন করিত এবং বনের মধ্যে আসিয়া সমস্ত জিনিষপত্র যথাস্থানে রাখিয়া দিত। আহারাদি শেষ করিয়া ভগবান বুদ্ধদেব যখন বিশ্রাম করিতেন, তখন শুঁড়ে করিয়া তালবৃন্ত লইয়া সে প্রভুকে ব্যজন করিত। এরপর রাত্রে যখন বুদ্ধদেব শয়ন করিতেন, তখন একটি বংশদণ্ড শুঁড়ে ধরিয়া পারিলেয়ক সারারাত্রি জাগিয়া বনের হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ হইতে তাহার প্রভুকে রক্ষা করিত। এরপর রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিত্যকার কাজ আবার আরম্ভ হইয়া যাইত।

এইভাবে প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হইল। বৌদ্ধ-সঙ্ঘে ছয়বার নানরূপ মতবিরোধ দেখা দিল। বুদ্ধদেবের আশ্রম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমণদের জ্ঞান জ্যোতিঃ তপঃ তেজ সমস্তই যেন তিরোহিত হইতেছিল। এমন কি মঠের শিষ্য সেবক সকলেরই শ্রদ্ধা-ভক্তি ধীরে ধীরে কমিতে-ছিল। এইবার শ্রমণেরা ঠিক মত বুঝিতে পারিলেন যে, বৌদ্ধ-বিহার রক্ষা করিতে হইলে ভগবান্ বুদ্ধবেদকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার তাহাদের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইহার পর তাঁহারা সকলে মিলিয়া বুদ্ধদেবের অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহারা খবর পাইলেন যে, অরণ্যের মধ্যে বুদ্ধদেব বাস করিতেছেন এবং বনের এক হস্তী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছে। এই খবরে তাঁহারা অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং নিজেদের অপরাধের পরিমাণ বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তাঁহাদের সমস্ত অহঙ্কার ও অভিমান এক মুহূর্তে ভাসিয়া গেল।

একদিন সমস্ত শিষ্যের প্রতিনিধি হইয়া ভগবান বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য আনন্দ বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পারিলেয়ক

বংশদণ্ড লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। শেষে বুদ্ধদেবের আদেশে পারিলেয়ক তাঁহাকে বুদ্ধদেবের নিকটে আসিতে বাধা দিল না। আনন্দ এইবার বুদ্ধের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এরপর বৌদ্ধ-সঙ্ঘের দুরবস্থার কথা সমস্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন যে, পঞ্চশত শ্রমণ অরণ্যের বাহিরে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। বুদ্ধদেব তখন আনন্দকে এই সমস্ত শ্রমণ শিষ্যদের তাঁহার নিকট লইয়া আসিতে বলিলেন। শ্রমণগণ আদেশ পাইয়া সকলে আসিয়া বুদ্ধের চরণে পতিত হইয়া তাঁহার ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

সকল শিষ্যের কাতর প্রার্থনায় শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব তাহাদের সহিত বিহারে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু অনুগত পারিলেয়ককে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার মনেও কষ্ট হইতে লাগিল। আর পারিলেয়ক তাহার প্রভুর মনের অবস্থা বুঝিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া সেবা করার সাধ যে তাহার তখনো মেটে নাই, অথচ অবোধ পশু সে তার মনের ভাব প্রকাশ করিবে কি প্রকারে? এবার সে প্রভুর যাত্রাপথ বন্ধ করিবার জন্য তাহার বিশাল বপু লইয়া পথের উপর শুইয়া পড়িল। ভগবান্ বুদ্ধ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া শিষ্যদের বলিলেন যে, আজকের মত তোমরা সকলেই এখানে অবস্থান কর। পারিলেয়ক আজ তোমাদের অতিথি সেবা করিবে। সুতরাং সে দিনের মত পঞ্চশত শিষ্যসহ বুদ্ধদেব সেই বনেই বাস করিলেন। পরদিন প্রভাতে পারিলেয়ক রাশীকৃত আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতি সুস্বাদু ফল আনিয়া হাজির করিল। সকল শিষ্যসহ বুদ্ধদেব এই ফল আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

বুদ্ধদেব এইবার শিষ্যদের লইয়া বন ছাড়িয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পারিলেয়ক পুনরায় পথের উপর শুইয়া পড়িয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। এবার ভগবান বুদ্ধদেব তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। তখন সে তাঁহাদের পথ ছাড়িয়া দিল সত্য, কিন্তু মুখের ভিতর শুঁড় পুরিয়া এমন করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল যে, তাহার সেই আর্ত-ক্রন্দনে সকলের প্রাণেই প্রিয়জন-বিচ্ছেদের শোক উথলিয়া উঠিল।

এইভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে পারিলেয়ক বুদ্ধদেবের পিছনে পিছনে চলিল। শেষে লোকালয়ের কাছে পৌঁছিলে ভগবান বুদ্ধ তাহাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পারিলেয়কের মন কিছুতেই বুদ্ধদেবের সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু তথাপি প্রভুর আদেশ অমান্য করিতে পারে না, তাই সেইখানে দাঁড়াইয়াই নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে শিষ্য পরিবৃত ভগবান বুদ্ধদেব যখন দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেলেন, তখন দারুণ দুঃখে পারিলেয়ক সেইখানেই মাটিতে শুইয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

॥ছড়া ও ছবি॥ ॥বিমানচাঁদ মল্লিক॥

এক যে আছে পুষি
ইঁদুর দেখ ভয়েই মরে,
ভাগ্‌নে দেখে খুসী।
সে যে বাঘের মাসী পুষি।

বাঘ সে তো নয় যেমন-তেমন
সোঁদর বনের বাঘা
একদিনেতে ফেলল খেয়ে
তিনটি হাজার কাগা।

কাক ডাকে না সকাল বেলা,
ঘুমোয় সুয্যি মামা।
দিনের বেলা রাতের আঁধার
দিচ্ছে সুখে হামা।

ঘুমোয় ঘরে খোকন সোনা,
ঘুমোয় দোরে পুষি,
ঘুমোয় বনে ভাগ্‌নে বাঘা—
ঘুমের মাঝই খুসী।

ঘুমোয় শুয়ে রাজার মেয়ে
ঘুমোয় সারা দেশ।
কেউ জানে না কবে হবে
এই ঘুমেরই শেষ।

কোথায় আছে রাজার ছেলে ?
কোথায় সোনার কাঠি ?—
যার ছোঁয়াতে জাগবে সবাই,
জাগবে দেশের মাটি।

দক্ষিণ মেরু ও উত্তর মেরু

নতুন করে আবিষ্কার

'সন্ধানী'

১৯৫৮ সালে দক্ষিণ মেরু নূতন করে আবিষ্কৃত হয়েছে।

দক্ষিণ মেরু প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯১১ সালে নরওয়ের ক্যাপ্টেন আমণ্ডসেনের দ্বারা। তারপর ১৯১২ সালে ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন স্কট দক্ষিণ মেরুতে পৌছুতে পেরেছিলেন। তারপর ৪৬বৎসর পরে এই বছরে আরও দুইজন দক্ষিণ মেরুতে পৌছুতে পেরেছেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন স্যার এডমণ্ড হিলারী, যিনি টেনজিং-এর সঙ্গে এভারেষ্ট বিজয় করেছিলেন, আর একজন হচ্ছেন ইংরাজ ভিভিয়ান ফুচ্।

কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক ঘটনা হচ্ছে এই বছর উত্তর মেরুতে পৌছনো। সাধারণ ভাবে চিরতুষারাবৃত জমির উপর দিয়ে মেরুতে পৌচেছেন অনেকেই। উড়োজাহাজেও দুইজন মেরুতে পৌছন। এবার উত্তর মেরুতে পৌছনো কেবল বিস্ময়কর নয়—বিজ্ঞানের চরম উন্নতির একটি স্বাক্ষর। বিখ্যাত ফরাসী লেখক জুলে ভার্ণ নব্বই বৎসর আগে তাঁর বিখ্যাত অ্যাড্ভেঞ্চারের বই—'টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লিগস্ আণ্ডার দি সী'-তে 'নটিলাস' (Nautilus) নামক একটা ডুবো-জাহাজ সমুদ্রের ২০,০০০ লিগ নিচে দিয়ে যাবে কল্পনা করে গিয়েছিলেন। বিখ্যাত লেখকের এই কল্পনা ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাসে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। একটি আমেরিকান ডুবো-জাহাজ, যার নাম রাখা হয়েছিল জুলে ভার্ণের ডুবো জাহাজের নামে,—সেই 'নটিলাস' নামক ডুবো-জাহাজটি ডুব দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে যাত্রা ক'রে, উত্তর মেরুর চিরতুষার চাপের নিচে দিয়ে একেবার আটলান্টিক মহাসাগরে এসে পড়েছিল। এই প্রকাণ্ড লম্বা যাত্রা-পথে ডুবো জাহাজটিকে ১,৮৩০ মাইল পথ বরফের তলা দিয়ে গিয়ে দক্ষিণ মেরু ভেদ করে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে পৌছতে হয়। উত্তর মেরুতে বরফ ৫০ ফিট পুরু, এবং তার মধ্যে মধ্যে অনেক ছিদ্র দেখা যায়। কিন্তু ঠিক দক্ষিণ মেরুর কাছে বরফের নিচে সমুদ্রের গভীরতা ১৩,৪১৪ ফিট এবং জলের শৈত্য সেখানে ৩২ ডিগ্রী। শীতকালে সমস্ত মেরুপ্রদেশ অন্ধকারাবৃত, গ্রীষ্মে আলো দেখা যায়।

হনলুলু থেকে গত ২৩ জুলাই এই ডুবো-জাহাজটি যাত্রা ক'রে বেরিং ষ্টেটের ভিতর দিয়ে আর্টিক মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে। এই জাহাজের যাত্রী-সংখ্যা ছিল ১১৬। ১লা আগষ্ট এই সাবমেরিনটি সমুদ্রের ভাসমান বরফের তলায় প্রবেশ করে ডুব দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। টেলি-ভিশনের সাহায্যে সাবমেরিনের যাত্রীরা মাথার উপরে স্বচ্ছ বরফ দেখতে পান। তাঁদের মনে হয় যেন মাথার উপর দিয়ে মেঘ ভেসে চলেছে। ৩রা আগষ্ট সাবমেরিনটি দক্ষিণ মেরুর ঠিক তলা দিয়ে ডুবে এগিয়ে চলে। তারপর একেবারে গ্রীনল্যাণ্ড ও স্পিটসবার্জেনের মধ্যে এসে ডুবো

জাহাজটি জলের উপর ভেসে ওঠে। ৯৬ ঘণ্টা ক্রমাগত বরফের তলায় ডুব দিয়ে এই ডুবো-যানটিকে অগ্রসর হতে হয়েছিল, আর অতিক্রম করতে হয়েছিল ১,০৩০ মাইল পথ।

তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কি করে এমন আজব ব্যাপার সম্ভবপর হোল। এর উত্তর হচ্ছে: আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে যে সাবমেরিন মাত্র দুই দিন পর্যন্ত জলের নিচে ডুবে থাকতে পারতো—এখন এই নূতন ধরনের সাবমেরিন ৯৬ ঘণ্টা অনায়াসে জলের তলায় ডুবে থাকতে পেরেছে। আটম শক্তির দ্বারা পরিচালিত বলে এই জাহাজের যাত্রীদের জন্য যা বাতাস দরকার তা এই জাহাজেই পাওয়া যেত। জাহাজটি ছিয়ানব্বই ঘণ্টা জলের তলায় ছিল এবং আবশ্যক হোলে আরও অনেক ঘণ্টা বেশী থাকতে পারতো আটমের পরিচালনা শক্তিতে! এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, মেরুর কাছে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র অর্থাৎ Mariners Compass, যার সাহায্যে সমুদ্রে জাহাজ ইত্যাদির দিক্‌নির্ণয় করে চলে, একেবারে অকেজো হয়ে যায়। পথ-প্রদর্শক কোন তারাও সাবমেরিনকে পথ দেখতে একেবারেই অসমর্থ এখানে। তাই এক নূতন আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনুসারে (Internal navigation system) এই জাহাজ সোজা পথ খুঁজে নিতে পেরেছিল।

কাঁকড়া

শ্রীনবকুমার ভট্টাচার্য

পুকুর পাড়ে,
জলের ধারে,
গরতে আমার বাস,
আমি নইকো কারো দাস।

পেটে ক্ষুধা হলে,
চলে যাই জলে,
চরে চরে বেড়াই,
জলের পোকা খাই।

পেট যদি না ভরে,
মাথায় আগুন চড়ে,
সামনে যা পাই
কামড় লাগাই।

তবু,—পেট যদি রয় খালি,
খাই ছোট্‌ট মাছ আর বালি,
মোর দেহটা শক্‌ত, ভাই
তাই ভয়ের কিছু নাই।

শুধু ভয় করি ঐ মানুষেরে,
আর ঐ বনের শেয়ালেরে,
ওরা মোরে খায়,
কড়মড়িয়ে খায়।

মোর ভরসা গোদা ঠ্যাং,
যত পাখী, পোকা, ব্যাঙ,
ভয়ে করে চিঃ, চিঃ, চিঃ
আমি হাসি হিঃ, হিঃ, হিঃ।

দাড়ি-মেধ

সত্যবান

শ্যামবাজারের বীরেনদা'কে চেনো তো নিশ্চয়। ঐ যে পাক্কা ছ'ফিট লম্বা, আড়াই ফিট চওড়া যে ভদ্রলোক আঠারো ইঞ্চি বাইসেপ্স্ ফুলিয়ে বিকেল বেলায় মাঝে মাঝে পার্কের মাঠে তরুণ সঙ্ঘের ছেলেদের মার্চ করান, বক্সিং শেখান, ঐ চত্বরের যত বখাটে ছেলে যার ভয়ে টিট্ হ'য়ে আছে, সেই স্বনামখ্যাত বীরেনদা'কে যদি না চিনে থাক তাহলে তোমার জন্মই বৃথা। অন্ততঃ শ্যামবাজারে না থেকে সুন্দরবনে বাস করাই তোমার উচিত ছিল।

কি একটা বড় কোম্পানীর ইন্স্পেক্টর ছিলেন বীরেনদা। ঘুরে ঘুরে বেড়ানই ছিল তাঁর কাজ। অফিসে সবাই ডাকত তাঁকে বীরন্দর সিং বলে। অবশ্য একমুখ কাল চাপ দাড়ী, বিরাট পালোয়ানী চেহারার বীরেনদাকে হঠাৎ দেখলে পেশোয়ারী কাবুলী বা পাঞ্জাবী শিখ ছাড়া অপর কিছু মনে করাই শক্ত ছিল। আর পাড়ার নটরাজ নাট্যভারতীর সদাড়ি পাটগুলো তো প্রায় বীরেনদারই একচেটিয়া ছিল।

সেবার, মানে বছর কয়েক আগেকার কথা। বীরেনদার ছোটশালীর বিয়ে শ্রাবণ মাসে। হঠাৎ কি একটা অফিসের জরুরী কাজে বীরেনদাকে চ'লে যেতে হ'ল লক্ষ্ণৌ না রুড়কী কোথায়। ফলে, বৌদি একাই সপুত্রকন্যা দুজনের হ'য়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। আর বাপেরবাড়ী গেলে মেয়েদের যা' হ'য়ে থাকে, শরীর খারাপের অজুহাতে থেকে গেলেন সেখানে। হ্যাঁ, বলতে ভুল হ'য়ে গেছে—বীরেনদার শশুরবাড়ী বীরভূমের ঐদিকে কোথায়।

বৌদির চিঠির মারফৎ ছোট ভায়রাভাই সমরেশের রূপগুণের সালঙ্কার বর্ণনা মাত্র পেলেন বীরেনদা এবং তাতেই প্রায় মোহিত হ'য়ে পড়লেন।

সেবার পূজার ছুটির আগে থাকতেই শশুরবাড়ীর সকলের কাছ থেকেই জোর তাগাদা আসতে সুরু করল। এবার যেতেই হ'বে পূজার সময়। ছেলে আর মেয়েকেও দেখেননি দু'মাস। শেষ অবধি নিমন্ত্রণ রক্ষাই স্থির ক'রে ফেললেন।

পূজার ছুটি এসে গেল। যথাসময়ে অফিসের কাজ সেরে বীরেনদা উঠলেন রাত সাড়ে ন'টায় ১৩নং আপ শিয়ালদহ দিল্লী এক্স্প্রেসে। ঝোড়ার মধ্যে পদ্মার ইলিশ মাছের চাইতেও ঠাসাঠাসি ক'রে গাড়ীর মধ্যে যাত্রীর দল। বাক্স, পোঁটলা, বিছানা, বালতি, ছাতা, লাঠি, ঝোড়া-ঝুড়ি, বুড়ো-বুড়ী, খুকী-খোকা, জোয়ান, মিনমিনে, মোটা, রোগা, চ্যাপ্টা ঢ্যাঙ্গা, বেঁটে, চৌকো, গোল,

বাঙ্কের উপর সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে স্যুটকেশ মাথায় বীরেনদা শুয়ে

মেয়ে-পুরুষ নানান দেশের নানান জাতের সব একেবারে তালগোল পাকিয়ে সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতন একটা শ্রীক্ষেত্র বানিয়ে ফেলেছে। বাইরে রঙ-বেরঙের আলখাল্লাপরা ভুতুড়ে টুপি মাথায় যে ছেলেটা চানাচুর ভাজা বিক্রি করতে নানান সুরে হরেকরকম ভঙ্গীতে চীৎকার করছে—"ভেরিয়াস —ভে এ এ রি য়াস ফুড্-গ্রেণ্স্, পুজা ইস্পিস্যাল —ভে এ রি য়া আস…" গাড়ীর ভেতরে অবস্থা তার চাইতে মোটেই ভাল নয়। কিন্তু এর মধ্যেও বীরেনদা যথারীতি নির্বিকার। বাঙ্কের একটি কোণে আপনার স্যুটকেশটির ওপর মাথা দিয়ে, চাদরখানা মুখের ওপর চাপিয়ে, ট্রেনের শব্দের সঙ্গে সমানভাবে নাক ডাকার পাল্লা দিতে লাগলেন।

নাক ডাকার মাহাত্ম্যেই হোক আর চেহারাখানার দৌলতেই হোক বর্ধমান অবধি বীরেনদা'কে আর ঘাঁটালনা কেউ। বর্ধমান স্টেশনে গাড়ী থামতেই লোকজনের ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি চা-গ্রম, কুলী, পান-সিগরাট ইত্যাদির কোরাসে পূজা-সংস্করণ লঙ্কাকাণ্ডেরই এক অধ্যায় সুরু হয়েছে, এমন সময় দিব্যি সাজগোজ করা সৌখীন মত এক ভদ্রলোক একরকম চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হ'য়ে অতি কষ্টে সাধ্যমত জামার ইস্ত্রী আর জুতোর পালিশ বাঁচাতে বাঁচাতে সেই কামরায় উঠে, আর কোথাও বসবার জায়গা না পেয়ে, সেই অগাধ সমুদ্রে একটুখানি লাইফবোটের মতন বীরেনদার বাঙ্কের কাছে এসে বীরেনদাকে মারলেন এক ধাক্কা—ও মশায় উঠুন না, শুতে হয় ফার্ষ্ট ক্লাশে গিয়ে বার্থ রিজার্ভ

ক'রে শোন গে যান। তর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের ঠেলায় স্যুটকেশটা ওপরে রাখতে গিয়ে লাগালেন এক ধাক্কা বীরেনদারই মাথায়।

আর যাবে কোথায়! বীরেনদার মাথায় গেল রক্ত চ'ড়ে। একে আচমকা ঘুম ভাঙ্গান, তার ওপর গাল দেওয়া, তার ওপর মাথায় স্যুটকেশের ঠোক্কর—একেবারে ত্র্যহস্পর্শ!—'তবে রে', ব'লে উঠেই বীরেনদা লাফিয়ে নেমেই সেই ভদ্রলোকের দিকে ছুড়লেন এক বিরাশী পাউণ্ডের ঘুষি। জোলুই-মার্কা ঘুষিটা লাগল কোথায় বলা যায় না, কিন্তু ফল হ'ল রীতিমত রোমহর্ষণ। 'বাপ্', বলে ভদ্রলোক তো দুই হাত তুলে চিৎপাত পাশের এক বুড়ীর ঘাড়ে। বুড়ীর পাশে ব'সে ঢুলছিল এক বুড়ো মাড়োয়ারী। তিনজনে মিলে তালগোল পাকিয়ে পড়ল বেঞ্চির মাঝে কোন্ এক প্যাসেঞ্জারের বাসনের বস্তাটার ওপর। ঝনঝন শব্দে সেগুলো গিয়ে লাগল এক ভদ্রমহিলার হাঁটুতে। অভাগিনী ভদ্রমহিলা তাঁর ফ্যাসান-দুরস্ত সাজগোজের মর্যাদা একদম ভুলে, তারস্বরে আর্তনাদ করতে গিয়ে দিলেন বাচ্চা ঘুমন্ত ছেলের হাত চিপ্‌টে। তারপর সে এক হৈ চৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড।—'খুন, খুন, পুলিশ, স্টেশন মাষ্টার, গার্ড সাহেব, চেন টেনে দাও (যদিও ট্রেন তখন দাঁড়িয়ে), কি হ'ল মশায়'—ইত্যাদি শব্দের বহু বিচিত্র সমারোহের ঐক্যতানে যেন বিপুল অর্কেষ্ট্রা বেজে উঠল।

রাগের মাথায় হঠাৎ ঘুষিটা মেরেই বীরেনদার ঘুমের ঘোর কেটে গিয়েছিল। এ সব গোল-মেলে ব্যাপারে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোক যা ক'রে থাকে, তিনিও তাই করলেন। চাদরখানার মায়া ত্যাগ ক'রে স্যুটকেশটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর জানালা গ'লে টপ্‌কে পড়লেন ওপারে। তারপর আধা-অন্ধকারে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গিয়ে, দূরে প্রায়-খালি একটা ফার্ষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়া শক্ত হ'লনা তাঁর পক্ষে। গাড়ীতে যে সাহেবটি ছিল আড়চোখে বীরেনদার সাজপোষাক আর চেহারার দিকে তাকিয়ে ভাল ছেলেটির মত নিজের বার্থে উঠে শুয়ে পড়ল। ভাবলে—এ পাঞ্জাবীটা বোধ হয় রেলের বা কোলিয়ারীর কোন অফিসার।

এদিকে অপর কামরার সেই ভদ্রলোক তখনও অজ্ঞান। তবে ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগার চীৎকার তখন একটু ক'মে এসেছে। ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে সংবাদ গিয়েছে যে, একজন ভয়ঙ্কর চেহারার কাবুলী ছোরা মেরে এক ভদ্রলোকের যথাসর্বস্ব, এমনকি প্রাণটি পর্যন্ত লুট ক'রে নিয়ে পালিয়েছে। পরে শোনা গেল সেটা নাকি একজন কাবুলী নয়, একজন দুর্ধর্ষ পেশোয়ারী ডাকাত। মানুষ খুনও নাকি স্বচক্ষে দেখেছেন ব'লে পাশের কামরার কেউ কেউ সরবে জাহির করতে লাগলেন। তারপর সুরু হ'ল সমালোচনা—এসব ক্ষেত্রে চিরকালই যা' হ'য়ে থাকে।

এদিকে ট্রেন আবার ছাড়ল। সাঁইথিয়াতে পৌছলে বীরেনদাকে পাকড়াও করলেন বীরেন-

দারই এক বন্ধু। তিনি ওখানে ষ্টেশনের কাছেই থাকেন—সিভিল সাপ্লাইতে বেশ শাঁসাল গোছের চাকরি করেন। ফলে বীরেনদা'কে উঠতে হ'ল তাঁর বাড়ীতে।

ছোট জামাই সমরেন্দ্র ইতিমধ্যে শশুরবাড়ী পৌঁছে গেছে। কপালে মস্তবড় একটা ফেটা জড়ান, চশমা ভাঙ্গা, ঠোঁট দুটো ফুলে হটনটট্‌দের লজ্জা দিচ্ছে, নাকটাতে জোলুই-এর তুলনা মেলে। বাড়ীতে সবাই তো আঁতকে উঠল। বাবাজীর তখন আর ভাল ক'রে কথা বলার সামর্থ্য নেই। একপশলা ডাক্তারের মলম লাগিয়ে আর কড়া কয়েক ডোজ ওষুধ খেয়ে চুপচাপ পড়ে রইলেন তিনি।

সেদিন এই ভাবেই কাটল। পরদিন সপ্তমী পূজা। সন্ধ্যায় পাশের পূজা বাড়ীতে যাত্রা হবে। আরতি আর যাত্রা দেখার জন্যে সকলের নিমন্ত্রণ—সবাই যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বারান্দায় ব'সে ছোট জামাই তার নাক থেঁতলানোর লোমহর্ষণ ইতিহাস বর্ণনা ক'রে চলেছে। ইতিমধ্যে সে একটু সামলে উঠেছে।

···হ্যাঁ, তারপর যা' বলছিলাম দিদি। তারপর সেই চারটে কাবুলীর মধ্যে দুটো যখন ভিড়ের মধ্যে বসবার জায়গা পেলনা, তখন হঠাৎ ছোরা বার ক'রে একটি মহিলাকে প্রায় জোর করেই তুলে দিল। তারপর পাশের আর দুটি নিরীহ গোছের লোককে লাঠির গুঁতো দিয়ে হুঁকার দিলে—'এ বাঙ্গালী, উঠো উঠো, বেহকুব্ কাঁহাকা···!' আমার আর সহ্য হ'ল না। একে মেয়েদের অপমান, তার ওপর জাত তুলে গাল দেওয়া! 'চাপ্ রও উল্লু!' ব'লে মারলাম এক বেটার নাকে এক ঘুষি। আর এক বেটা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেই সেই বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়েই জুতোসুদ্ধ ঝেড়ে দিলাম এক লাথি বেটার পেটে। দু' বেটাই তো 'বাপ্ পা হো' ব'লে পপাতঃ ধরণীতলে। গাড়ীর ভিতরের আর সব প্যাসেঞ্জারগুলো তখন এককোণে জাড়জড়ি ক'রে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। একটার হাত চেপে ধরেছি, এমন সময় আর এক বেটা তেড়ে মেরে দিল তার গোদা লাঠিটা পেছন থেকে আমার মুখের ওপরে। হাত দিয়ে ঠেকাতে গিয়েও পারলাম না। তারপর একদিকে আমি আর একদিকে সেই কাবুলী দুটো—তুমুল ঘুষোঘুষি। শেষে আর দু'বেটাও উঠে এসে যোগ দিলে। ইতিমধ্যে রেলের পুলিশ এসে চার-ব্যাটাকেই'···

নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে গল্প শুনছে সবাই। হঠাৎ বেলু চেঁচিয়ে উঠল—মা, মা, বাবা···ঐ দেখ!

দূরে দেখা গেল গেটের মধ্যে দিয়ে সুট-পরা স্যুটকেশ নিয়ে ঢুকছেন বীরেন্দ্রচন্দ্র। হৈ হৈ করতে করতে বাড়ীর সব ছুটল বীরেন্দ্রচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করতে।

অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'তে, আর দেরি হওয়ার জন্যে কৈফিয়তের জের মিটতে, বেশ খানিকটা সময় কাটল। ছেলেপুলের দল ঠাণ্ডা হ'লে বীরেনদার শাশুড়ী বললেন, 'চলো বাবা তোমাকে ছোট জামাই-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

কিন্তু ছোট জামাই ততক্ষণে যেন উপে গিয়েছে। বেশ খানিকটা খোঁজাখুঁজি করেও যখন তার পাত্তা মিলল না, তখন বাড়ীর লোকেরা স্থির করল যে, শহরেই কোথায় তার কোন্ এক বন্ধুর বাড়ী আছে বলেছিল, বোধ হয় সেইখানেই দেখা করতে গিয়েছে।

আর দেরি করা সম্ভব নয়। চৌধুরীবাড়ী আরতির সময় হ'য়ে গিয়েছে। আরতির পরই খাওয়াদাওয়া, তারপরই যাত্রা গান সুরু হ'বে। বাড়ীর সকলের আগে থেকেই নিমন্ত্রণ সব কটাতেই।

পাড়াগাঁয়ের যাত্রা আর হাঁকডাকের ওপর নিতান্ত শহুরে মানুষ বীরেনদার স্বাভাবিকভাবেই বিরাগ। তার চাইতে বিছানায় লম্বা হ'য়ে ঘুম লাগান অনেক বেশী লোভের। বাড়ীতেই জলটল খেয়ে ক্লান্তির অজুহাত দেখিয়ে বীরেনদা র'য়ে গেলেন বাড়ীতে এবং বৌদি সমেত সবাইকেই জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলেন পূজো-বাড়ী।

রাত প্রায় বারোটা। হঠাৎ কি একটা পড়ার শব্দে চম্‌কে ঘুম ভেঙ্গে গেল বীরেনদার। নীচে ভাঁড়ার ঘরের ভেতর কি যেন শব্দ হচ্ছে। নিশ্চয় চোর। জানে বাড়ীতে কেউ নেই ; চুরির মতলবে ঢুকেছে।

—'দাঁড়াও বেটা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ! আজ তোমার সিঁধকাঠি তোমার পিঠেই ভাঙ্গব !' বলতে বলতে বীরেনদাও ঘর থেকে বার হ'য়ে পড়লেন। হাতে টর্চ লাইট আর একগাছা মোটা লাঠি।

শ্বশুরবাড়ীর ঘর দুয়ার সবই জানা। তার ওপর চাঁদের আবছা আলো ভেতরে এসে পড়েছে জানালার ফাঁক দিয়ে। চুপি চুপি বীরেনদা এগিয়ে চললেন ভাঁড়ার ঘরের দিকে। ঘরের ভেতরে শুনলেন কি যেন একটা খুসখাস শব্দ হচ্ছে। কে যেন সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ। নিশ্চয়ই চোর ! এ্যাড্‌ভেঞ্চারের সম্ভাবনায় বীরেনদা তখন রীতিমত উত্তেজিত। হাতের টর্চ আর লাঠির ওপর আঙ্গুলগুলো লোহার সাঁড়াশীর মত চেপে বসেছে। তাই বাইসেপ্স আর বুকের ছাতি ফুলে উঠেছে প্রায় দু'গুণ ! চোরের আজ আর রক্ষা নেই !

হঠাৎ কি যেন 'ফ্যাঁস্' করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে, 'বাবাগো' বলে চাপা আর্তনাদ আর দড়াম ক'রে শব্দ। বাজখাঁই গলায়, 'খবরদার' ব'লে হাঁক দিয়ে লাফিয়ে বীরেনদা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দাঁড়ালেন। হাতের টর্চ জ্বলে উঠল।

বাড়ীর ভুতো বেড়ালটা 'ম্যাঁওও' ব'লে ছুট দিল পায়ের ফাঁক দিয়ে বাইরে। টর্চের আলোতে দেখা গেল একটা এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ী উপুড় হ'য়ে প'ড়ে। গোটাকতক পান্তুয়া এদিক-ওদিক ছড়ান। তার মাঝখানে তালগোল পাকিয়ে প'ড়ে আছে একটা মানুষ। টর্চের আলো গায়ে

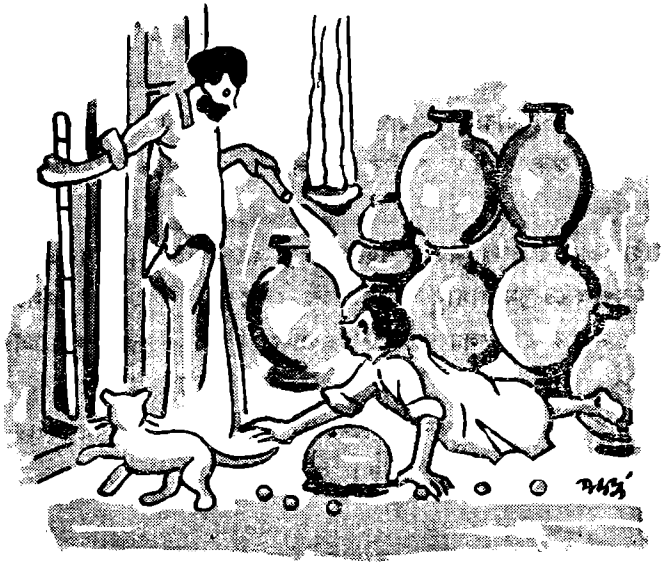

খররদার। ব'লে বীরেনদা টর্চ জ্বেলে ধরলেন

পড়তেই সন্ত্রস্ত হ'য়ে চমকে উঠলো লোকটা ; তারপর হামাগুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি লুকোতে গেল যে চৌকিটার ওপর ডালের হাঁড়িগুলো আছে তার আড়ালে।

'এই ব্যাটা, দাঁড়া, কে তুই ?' বজ্রগম্ভীর স্বরে বীরেনদার গর্জন। সে চীৎকারে সাধারণ লোকের পিলে রীতিমত চমকে যাবে। গেলবার পূজার সময় শ্যামবাজার পার্কের মোড়ে নটরাজ নাট্য-ভারতীর 'কর্ণার্জুন' অভিনয়ের সময় ভীমবেশী বীরেনদার দুঃশাসনের রক্তপান যারা দেখেছে তারা বুঝতে পারবে এ গর্জন কি বিপুল !

'আজ্ঞে, আমি, আমি···' থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে লোকটা উঠে দাঁড়াল। বীরেনদা দেখলেন চোর হলেও তার পোশাকটা বেশ ভদ্রগোছের, চেহারাটাও ভাল—যদিও রস আর কাদায় জামা-কাপড়ে ছোপ লেগে গুলবাঘের মতন হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। একেবারে ছিঁচকে চোর ব'লে মনে হ'ল না। লাঠিটা সোজা বসিয়ে দিতে একটু দ্বিধা লাগল।

আজ্ঞে আমি···মানে ?' বীরেনদার সগর্জন ধমক।

'আজ্ঞে—আজ্ঞে-এ···আমি, আমি,·· মানে এ-বাড়ীর ছো-ছোট জামাই ; মানে সমরেন্দ্র···'

'আরে, সমরেন্দ্র তুমি,···' ব'লে আর একটু ভাল ক'রে টর্চ ফেলে দেখতে গিয়ে বিষম রকমের চমকে উঠলেন বীরেনদা। যেন চেনা চেনা লাগছে ! তাছাড়া কপালের কাটা দাগ আর ফুলো ঠোঁট।···

আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা, তোমাকেই কি আমি ভুল ক'রে দিল্লী এক্স্প্রেসে···' বাকিটা সঙ্কোচে আর শেষ করতে পারলেন না।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' প্রায় কাঁদো কাঁদো হ'য়ে উত্তর দেয় সমরেন্দ্র: 'আপনার ঘুষিতেই আমার এই রকম…'

বিদ্যুতের ঝলকের মতন মনে প'ড়ে যায় বীরেনদার, বর্ধমানের কাছেই কোন একটা গ্রামে যেন ছোট শালীর বিয়ে হয়েছে—এইরকম একটা খবর পেয়েছিলেন। আরও মনে পড়ল বৌদির চিঠির কথা—সমরেন্দ্রও নাকি শ্বশুরবাড়ী পূজার সময় আসছে।

শেষে ভিড়ের মধ্যে নিজের ভায়রাভাইকেই আরে ছিঃ ছি ছি

লজ্জিত ভাবে বীরেনদা আমন্ত্রণ জানান: 'আরে এস ভাই এস। চল আমার সঙ্গে উপরকার ঘরে চল।'

সভয় দৃষ্টিতে একবার বীরেনদার লাঠি, একবার বাইসেপ্স্ আর বুকের ছাতির দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসার আভাস আনায় সমরেন্দ্র, 'আজ্ঞে—আ-আ-আপনি ?…'

'আমি বীরেন্দ্র হে, এ বাড়ীর বড় জামাই, সম্পর্কে তোমার দাদা হই। আমায় আবার ভয় কি। চল চল…'

ওপরে গিয়ে সুস্থির আর সম্ভবমত সভ্য হয়ে বসবার পর, বীরেনদা শুনলেন সমরেন্দ্রের কাহিনী। বীরেনদাকে গেটের কাছে দেখেই বেচারা বুঝেছিল যে, এবার কেলেঙ্কারীর একশেষ। গল্পের রঙ্ চঙ ধুয়ে গিয়ে এবার আসল কাহিনীর খড়দড়ি সব বার হ'য়ে পড়বে। তাই সবাই যখন সদরে বীরেনদাকে অভ্যর্থনা করতে ছুটেছে তখন চুপি চুপি পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে চৌকির তলায় লুকিয়ে পড়ে সে। মতলব করেছিল যে, রাতে বীরেনদার ছোট শালী ফিরলে তার কাছে জেনে নেবে সব ব্যাপারটা। এদিকে মাঝ রাতে পায় ভয়ানক খিদে। শিকের ওপরকার পান্তোয়ার হাঁড়ীটা অন্ধকারে নামাতে গিয়ে হাঁড়ী উল্টে নীচে প'ড়ে যে শব্দ হয়, তাতেই বীরেনদার ঘুম ভেঙ্গে যায়। অন্ধকারে হাঁতড়ে হাঁতড়ে যখন পান্তোয়া খুঁজে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছিল তখন না দেখতে পেয়ে বাড়ীর বেড়ালটার লেজের ওপর আচমকা পাটা প'ড়ে যায়। সেটা আবার ঢুকেছিল অন্ধকারে ইঁদুর ধরতে। হঠাৎ সবে ধন নীলমণি একটি মাত্র ফুলো লেজের ওপর এরকম রাহাজানী হওয়াতে আপত্তি জানিয়ে ফ্যাঁস্ ক'রে ওঠে বিড়ালী। সেই শব্দে সমরেন্দ্র স্থির ক'রে নেয় যে নিশ্চয় গোখরো সাপ—কামড়াল তাকে।

হঠাৎ বীরেনদার পা জড়িয়ে ধরে সমরেন্দ্র। বলে, 'তিনি যেন কাউকে না বলেন এসব কথা। কারণ, মানসম্ভ্রম সবই এখন বড়দা আপনার হাতে।' মানে বীরেনদা এখন 'বড়দা'তে প্রমোশন পেয়ে গেছেন।

বীরেনদা স্তম্ভিত নির্বাক। সামলে নিতে বেশ খানিকটা সময় লাগল তাঁর।

তারপর দুই জামাইয়ে মিলে সুরু হ'ল সলা-পরামর্শ—কি করলে সব দিকই বজায় থাকে। তারই ফলে শেষ রাতের গাড়ীতে সমরেন্দ্র একেবারে সাঁইথিয়া, তারপর সেখান থেকে কলকাতায় উধাও।

পরের দিন সকালে যাত্রা শুনে সব বাড়ী ফিরে ছোট জামাই-এর খোঁজ নিতেই বীরেনদা গম্ভীরভাবে সাফাই দিলেন যে, 'সমরেন্দ্র রাত ৯টার সময় বন্ধুর বাড়ী থেকে ফিরে এসেই এক টেলিগ্রাম পায়, তার সাহেব কলিকাতায় এসে কি এক বিশেষ জরুরী কাজে তার করেছে। একটুও দেরি করার উপায় ছিল না। রাতের শেষ ট্রেনেই তাই সে চ'লে গেছে। সময় না থাকায় কারুর সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে পারেনি।'

হ্যাঁ, আসল খবরটাই বলতে ভুল হ'য়ে গিয়েছে।

পরের দিন সকালে কাগজে দেখা গেল যে লোমহর্ষণ এক ডাকাতির বিবরণ বার হয়েছে: পঞ্চমীর রাতে জনকয়েক কাবুলী না পেশোয়ারী ডাকাত বর্ধমান স্টেশনে আপ দিল্লী এক্স্‌প্রেসে ঢুকে কি কারণে কয়েকজন যাত্রীকে মারপিট করতে থাকে। বাধা দিতে যাওয়ায় একজন যাত্রীকে ছোরা মেরে গুরুতর জখম করে দেয়, বেচারার বাঁচবার নাকি বিশেষ আশা নেই। আর একজন যাত্রীর কোন সন্ধান মিলছে না। ডাকাতের দল যাত্রীদের কিছু টাকাকড়ি আর জিনিসপত্রও ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। রেল-পুলিশ জোর তদন্তে লিপ্ত আছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও নাকি করা হয়েছে।—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বীরেনদা প'ড়ে নিজের মনে মনে হাসলেন বটে, কিন্তু কলকাতা ফেরার আগে তাঁর অত সাধের সুপুষ্ট দাড়িটিকে শ্বশুরবাড়ীর নাপিতের হাতে একটাকা দক্ষিণা সমেত দান ক'রে এলেন। এ দাড়ি-মেধের রহস্য আজ অবধি একমাত্র বীরেন-বৌদি ছাড়া আর কেউ জানে না।

তারপরের বার সরস্বতী পূজার সময় নটরাজ নাট্য-ভারতীর যে 'কেদার রায়' প্লে হ'ল, তাতে কার্ভালোর পার্ট নিলেন বীরেনদা—সে তো শ্যামবাজারের সবাই জানে।

———

॥ দানবীর ॥

শ্রীবিমলকুমার ঘোষ

তোমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম শুনেছ। দেশের হিতের জন্য, দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁর সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তোমরা অতি-আধুনিক চিত্তরঞ্জন, পরলোকগত রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নামও হয়ত অনেকে শুনেছ। প্রথম জীবনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকাকালীন তিনি তাঁর বেতনের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করতেন। রাজ্যপাল থাকাকালেও তিনি তাঁর বিপুল বেতন থেকে মাত্র পাঁচশ টাকা নিয়ে বাকী সবই বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছেন। বিশেষ করে আমাদের এই বাংলাদেশে যক্ষা আরোগ্যতর কলোনী গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা করার জন্য তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। আজ এমনি একজন দানবীরের গল্প শোনাতেই আমি তোমাদের ত্রেতাযুগে নিয়ে যাব।

তাঁর নাম ছিল রাজা উশীনর। দান-ধ্যান, ধর্মপ্রাণতার জন্য তখন তাঁর রাজ্যজোড়া নাম। তাঁর প্রশংসার কথা শুনতে শুনতে একদিন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রেরও হিংসে হল। ইন্দ্র তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য অগ্নিদেবের সঙ্গে এক পরামর্শ আটলেন। ইন্দ্র হলেন এক শ্যেন আর অগ্নি হলেন এক কপোত। শ্যেন যেন তার খাদ্য কপোতকে তাড়া করেছে এমনিভাবে অভিনয় করতে করতে তারা দু'জনে হুড়মুড় করে উশীনরের রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। প্রাণভয়ে কম্পমান কপোত রাজার কোলে আশ্রয় নিলে। রাজা তাকে বললেন, "তোমার কোন ভয় নেই। শরণাগতকে রক্ষা করা আমার ধর্ম। কেউই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি স্থির হয়ে বস।" শ্যেন তখন রাজাকে বললে, "মহারাজ, কপোত আমার ভক্ষ্য। আপনি ওকে ছেড়ে দিয়ে আমার প্রাণরক্ষা করুন।" রাজা বললেন, "তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে আমি বাধ্য। তুমি যে মাংস চাইবে, বল, আমি তাই এনে দিচ্ছি। কিন্তু শরণাগতকে ছেড়ে দিয়ে অধর্মে পতিত হতে পারব না।" শ্যেন তখন বললে, "আপনি ঐ একটি প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে অনেকগুলি প্রাণকে হত্যা করতে চান? আমি ক্ষুধার জ্বালায় মরে গেলে আমার উপর নির্ভরশীল আমার স্ত্রী-পুত্রও অনাহারে মারা যাবে। ঐ কপোত আমার ভক্ষ্য। ওর উপরে আমার স্বাভাবিক অধিকার আছে। আমি আপনার অযাচিত দয়া নেব কেন?" কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথার মত রাজার ঐ এক কথা। তিনি আশ্রিতকে ত্যাগ করতে পারবেন না। শ্যেন তখন বিদ্রূপ করে রাজাকে বলে উঠল, "ঐ সামান্য কপোতটার উপর যদি আপনার এতই দয়া, তবে ওর সমান মাংস আপনার দেহ থেকে কেটে আমাকে দিন না কেন!" রাজা তৎক্ষণাৎ ঐ প্রস্তাবে রাজী হয়ে তুলাদণ্ডের একটা

পাল্লায় কপোতটাকে রেখে নিজের হাতে নিজের দেহ থেকে মাংস কেটে ওজন করতে লাগলেন। কিন্তু অগ্নিদেবের মায়ায় বারবার মাংস কেটে ওজন করতেও কপোতের সমান হল না। রাজা তখন নিজেই তুলাদণ্ডে চেপে বসলেন। মুহূর্তে শ্যেন ও কপোত "সাধু", "সাধু" বলে স্বরূপ ধারণ করলে। স্তম্ভিত রাজা দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অপূর্ব রূপলাবণ্যময় দেবরাজ ইন্দ্র আর অগ্নিদেব। মুখে তাঁদের প্রসন্ন হাসি। ইন্দ্র রাজার ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে সেগুলি নিরাময় করে দিলে রাজা আবার তাঁর পূর্ব দেহই ফিরে পেলেন।

ইন্দ্র দু'হাত তুলে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। একেবারে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন, "রাজা তুমি ধন্য! তোমার কাছে আমরা পরাস্ত হলাম। শুনেছিলাম, ন্যায়ধর্ম ও ত্যাগে তুমি আমার অপেক্ষাও মহৎ। সেকথা যে সত্যি এখন তা প্রত্যক্ষ করে ধন্য আমরা। তোমার এই কীর্তি জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।"

"এত রূপকথা রোজ শুনি, তবু যখনি আকাশে চাই,
মনে হয়, ওই উহাদের কথা কেহ কি জানেনা, ভাই?
দলে দলে ওরা কোথা হ'তে আসে,
ঝিঁঝি ডাকে যবে হেথা চারিপাশে,
ফুলের গন্ধ বেড়ায় বাতাসে—
দেখিতে কিছু না পাই,
শুধু যে ওরাই চোখে-চোখে ডাকে, আকাশে যে-দিকে চাই।"

—মোহিতলাল মজুমদার

খেলাধূলার খবর

মেঠুড়ে

ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ

আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মার্কিন মহিলা সাঁতারু গ্রেটা এণ্ডারসন প্রথম স্থান অধিকার করে সমস্ত জগতকে বিস্ময়াভিভূত করেছেন। গতবারও শ্রীমতী এণ্ডারসন চ্যানেল সন্তরণে এই গৌরবের অধিকারিণী হয়েছিলেন। এই সাফল্যের ফলে গ্রেটা এণ্ডারসন আরো এক বছর ট্রফিটি নিজের কাছে রাখতে পারবেন। ১৯৫১ সালে ক্যানাডার বিলি বাটলিন এক হাজার স্টার্লিং পাউণ্ড দামের এই ট্রফিটি দান করেছিলেন। ট্রফিটি ছাড়াও শ্রীমতী এণ্ডারসন নগদে ১৯০০ স্টার্লিং পুরস্কার পাবেন।

একুশ মাইল দীর্ঘ এই সমুদ্রপথ অতিক্রমের জন্যে পাকিস্তানের শ্রীব্রজেন দাস সমেত মোট ত্রিশজন সাঁতারু ফ্রান্সের লাঁ সিঁয়েন উপকূল থেকে সমুদ্রে অবতীর্ণ হন। পনেরোটি রাষ্ট্রের ত্রিশজন সাঁতারুর ভেতর চারজন মহিলা সাঁতারু ছিলেন। শ্রীমতী গ্রেটা কেপ রিজনেজ থেকে ডোভার পর্যন্ত এই একুশ মাইল সমুদ্রপথ অতিক্রম করেন এগারো ঘণ্টায়। ১৯৫১ সালে ব্রিটেনের মহিলা সাঁতারু ব্রেণ্ডা কিসার ১২ ঘণ্টা ৪২ মিনিটে এই পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। এবার গ্রেটা তাঁর চেয়েও কম সময়ে এই পথ অতিক্রম করে রেকর্ড করলেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের সাতাশ বছরের বাঙালী সাঁতারু শ্রীব্রজেন দাস গ্রীণউইচ সময় বিকেল ৪টে ২ মিনিটে ডোভারের পুব দিকে ইংলণ্ডের মাটি স্পর্শ করে এ বছরের চ্যানেল সন্তরণে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। শ্রীমতী গ্রেটার প্রায় ৪ ঘণ্টা পরে শ্রীদাস ইংলণ্ডের উপকূলে পৌছন। চ্যানেল সন্তরণে তাঁর মোট ১৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময় লেগেছিল। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী হিসেবে শ্রীব্রজেন দাস পাঁচশ স্টার্লিং পুরস্কার পাবেন।

শ্রীব্রজেন দাসের জন্মস্থান ঢাকা। দেশ ভাগ হওয়ার আগে শ্রীদাস কলকাতার সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সদস্য ছিলেন। দূর পাল্লার সন্তরণে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে ব্রজেন দাস একাধিকবার পূর্ব পাকিস্তানের পদ্মা ও মেঘনায় সাঁতার কেটেছেন। ব্রজেন দাসের সাফল্যে পাকিস্তান সরকার ঢাকায় সরকারী ছুটি ঘোষণা করেছিলেন আমরা শ্রীদাসকে তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য অন্তরের সঙ্গে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

—

স্বাধীনতা দিবসে ক্রীড়ানুষ্ঠান

স্বাধীনতা দিবস ও শ্রীঅরবিন্দ জন্মদিবস উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ ক্রীড়া প্রদর্শনী কমিটির উদ্যোগে মহামেডান-এরিয়ান্স মাঠে যে ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়, তাতে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ

তৈরীর ব্যাপারে মন দিয়েছেন। কলকাতায় ষ্টেডিয়াম তৈরীর কথা উঠলে শ্রীমজুমদার বলেন, আদালতে বর্তমান যে মামলা দায়ের আছে তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কলকাতার ষ্টেডিয়াম তৈরীর কাছে হাত দেওয়া যাবে না।

—

রমানাথন কৃষ্ণানের সাফল্য

পশ্চিম জার্মানীতে আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস ফাইনালে ভারতের সেরা খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান জয়ী হয়েছেন। সিঙ্গলস ফাইনালে কৃষ্ণান তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ব্রেজিলের ফার্ণামডেকে পাঁচ সেটের খেলায় হারিয়ে দেন। কৃষ্ণান জয়লাভ করেন ৩-৬, ৬-৩, ৩-৬, ৬-১ ও ৬-২ মেটে। এ ছাড়াও ডাবলস ফাইনালে প্রাক্তন উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ন জারোস্লাভ ড্রবনির সঙ্গে জুটি বেঁধে কৃষ্ণান জয়লাভ করেছেন। কৃষ্ণান ও ড্রবনি ৬-২ ও ৬-২ সেটে ব্রিটেনের রোজার বেকার ও টনি পিকাউকে পরাজিত লরেন।

—

জে কনরাডের সাতটি বিশ্ব-রেকর্ড

আন্তর্জাতিক সন্তরণ সঙ্ঘের কংগ্রেসে অষ্ট্রেলিয়ার ষোলো বছরের কিশোর সাঁতারু জন কনরাডের ফ্রি স্টাইল সন্তরণে স্থাপিত সাতটি বিশ্ব-রেকর্ড অনুমোদন করা হয়। একক কোনো সাঁতারুর সংখ্যায় এতো বেশি রেকর্ড এর আগে কংগ্রেসে অনুমোদন করা হয় নি। কনরাড-এর রেকর্ডগুলো ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়ার মহিলা সাঁতারু ডন ফ্রেজারের ফ্রি স্টাইলে চারটে রেকর্ড অনুমোদিত হয়।

—

সাঁতারু মাও সে তুং

চীনের রাষ্ট্রপ্রধান চৌষট্টি বছরের মাও সে তুং-এর কর্মজীবনযাত্রার এক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। পিকিং-এর "ইভনিং নিউজ" পত্রিকার এক খবরে প্রকাশ যে, গত শীতকালে মাও সে তুং দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের ইয়াংকিয়ান নদী সাঁতার কেটে পার হন। শ্রীতুং তাঁর স্বাভাবিক পোশাক পরেই জলে নেমে আধ ঘণ্টারও বেশি জলে ছিলেন এবং এক হাজার গজ পথ অতিক্রম করেন। গত দু' বছরে শ্রীতুং সাঁতার কেটে চারবার ইয়াংসি নদী পার হয়েছেন।

—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নির্বাচিত খেলোয়ারবৃন্দ

আগামী অক্টোবর মাসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে সব খেলোয়াড়রা ভারত ও পাকিস্তান সফরে আসবেন নির্বাচকমণ্ডলী তাঁদের নাম ঘোষণা করেছেন। যে আঠারোজন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তাঁদের ভেতর আছেন জামাইকার ফ্রাঙ্ক আলেকজাণ্ডার (অধিনায়ক), জ্যাকি হেণ্ড্রিকস, রয় সিলক্রাইষ্ট, কলি স্মিথ, জন হোল্ট; বার্ণাবাসের গারফিল্ড সোবার্স, কনরাড হাণ্ট, এরিক এটাকিনসন, ওয়েসলি হল, রবিন বাইনো; ব্রিটিশ গায়নার বেসিপ বুচার, জো সলোমন, রোহন কানহাই; ত্রিনিদাদের উইলি রড্রিগম, জনউইক টেলার, সোনী রামাধীন প্রমুখ এক-ডাকে চেনা খেলোয়াড়বৃন্দ।

—

ধাঁধার পাতা

বুদ্ধির খেলা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

গণিত

[মুখে মুখে উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নে কুড়ি নম্বর করে মোট একশো নম্বর থাকল। তুমি কত পাও দেখ।]

১। এক গোয়ালা দশসের ও পাঁচ সের দুটি পাত্রে মোট পনর সের দুধ বিক্রি করতে এনে ছিল। তার পাঁচ-সেরী পাত্রের সব দুধ বিক্রি হ'য়ে গিয়েছে। এমন সময় একজন তিন সেরী একটি পাত্র নিয়ে এল এক সের দুধ নেবে বলে। আর কোন পাত্র সেখানে নেই। গোয়ালা ঐ লোকটিকে কি উপায়ে এক সের দুধ দিতে পারে?

২। নদীতে একখানি ছোট্ট নৌকা আছে। এই নৌকায় মাত্র একজন লোক এবং তার সঙ্গে আর একটা প্রাণী বা বস্তু যেতে পারে। একটি লোকের সঙ্গে আছে একটা বাঘ, একটা ছাগল এবং এক আঁটি পান। লোকটি কি করে এইসব নিয়ে পার হ'য়ে যেতে পারে? মনে রাখতে হবে লোকটি কাছে না থাকলে বাঘে ছাগল খাবে এবং ছাগলে পান খেয়ে ফেলবে।

৩। উঠানে দুটো কাঠি পুঁতে তার একটায় গুলি সুতোর এক প্রান্ত বাঁধলাম। তারপর ঘুরিয়ে অপর কাঠিতে জড়িয়ে আবার প্রথম কাঠিতে জড়িয়ে নিয়ে এলাম। এইভাবে জড়ানোর পর যে কাঠিতে প্রথমে সুতোর একপ্রান্ত বাঁধা হয়েছিল, সেই কাঠিতে এসে অপর প্রান্ত শেষ হ'ল। গুণে দেখা গেল দুই কাঠির মাঝখানে সুতোর ছ'টি তার হয়েছে। এরপর একটি দুষ্টু ছেলে এসে একখানা কাঁচি দিয়ে ঐ দুই কাঠির মাঝখানের ছ'টি তারই একসঙ্গে দু'বার করে কেটে দিলে। কাটা আস্ত সুতো ক' গাছা পাওয়া যাবে?

৪ আমি রান্না ঘরে থাকতে ভালবাসি। আমি গরম হলে তোমরা মনে কোরো না আমি রেগে গেছি। সব কাজই করতে আমি রাজী আছি। কাজ করতে করতে অনেক সময় আমি শিস্ দেই বা গান করি, বলতো আমি কে?

৫। একজন রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে ঠিক হ'ল সে চার ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া এবং চার ফুট খাড়াই একটি বেদী তৈরী করে দেবে। সেজন্য তাকে দেওয়া হবে বত্রিশ টাকা। সে দু' ফুট লম্বা, দু' ফুট চওড়া এবং দু' ফুট খাড়াই তৈরী করে জরুরী কাজে অন্যত্র চলে গেল। সে যতখানি কাজ করেছে তার জন্য সে কত পাবে?

৬। এক পুকুরের চার কোণায় চারটি শিব মন্দির আছে। মন্দিরের নিয়ম, যে ফুল নিয়ে পূজো করতে যাবে তার অর্ধেক দিয়ে শিব পূজো করে বেরিয়ে যাবার সময় একটা ফুল দরজায় ফেলে দিয়ে যেতে হবে, এবং শেষ মন্দির থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তোমার কাছে একটা ফুলও থাকবে না। ক'টা ফুল নিয়ে যাবে তুমি পূজো করতে?

—

কোন্ রাস্তায় ঘরে ফিরি!

৭। বেচারা মৌমাছি! পথ হারিয়ে ফেলেছে। কোন রাস্তা দিয়ে গেলে সে সহজে ঘরে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে পেন্সিলের লাইন দিয়ে ট্রেস্ করে দেখ।

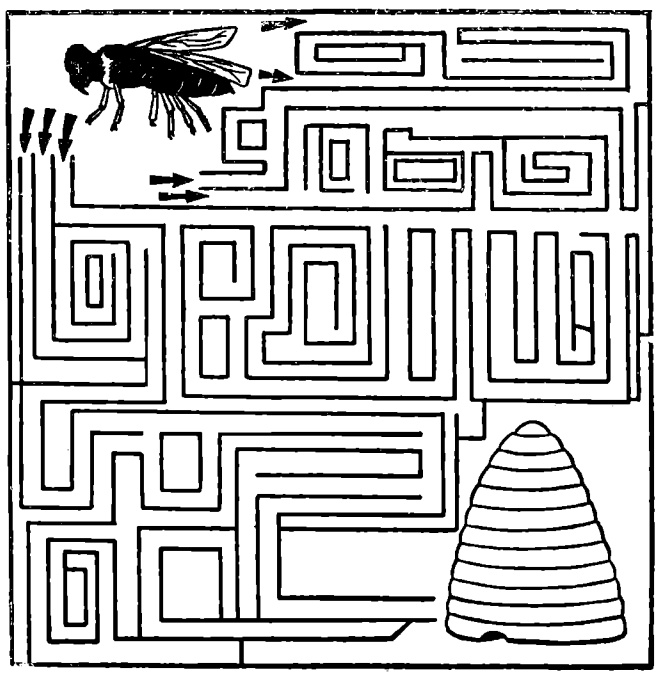

উত্তর

১। গোয়ালার কাছে পাত্র আছে দুটি—একটি পাঁচ-সেরী খালি এবং অপরটি দশ-সেরী দুধ ভর্তি। যে লোকটি দুধ কিনবে এক সের, তার কাছে আছে একটি তিন-সেরী খালি পাত্র। এই তিন-সেরী পাত্রে সে এক সের দুধ এই ভাবে নিতে পারে—

দশ সের দুধ থেকে তিন-সেরী পাত্রে তিন সের ঢাললাম। তারপর ঐ তিন সের দুধ গোয়ালার পাঁচ-সেরী খালি পাত্রে ঢাললাম। আবার ঐ দশ-সেরী দুধের পাত্র থেকে তিন-সেরী পাত্রে তিন সের দুধ ঢাললাম। পাঁচ-সেরী পাত্রে এখন তিন সের দুধ আছে। ঐ পাত্রে তিন-সেরী পাত্র থেকে আরও দু'সের দুধ ঢেলে দিলে ঐ পাত্রে থাকবে এক সের। এই ভাবে এক সের দুধ কেনা যাবে।

২। লোকটি প্রথমে ছাগলটাকে নিয়ে ওপার যাবে। এপারে বাঘে পান খাবে না। তারপর ফিরে এসে পান নিয়ে ওপার যাবে। এবার থাকবে বাঘ একা। ওপারে পান রেখে ছাগলটাকে সঙ্গে করে এপারে আসবে। এবার ছাগলটাকে এপারে রেখে বাঘকে ওপারে রেখে আসবে। তারপর ফিরে এসে ছাগলটাকে নিয়ে ওপারে যাবে।

৩। খণ্ড সুতো পাওয়া যাবে তের গাছা। তার মধ্যে এক দিকে দুটো ও অপর দিকে তিনটে বড় টুকরো, মাঝখানে দুটো এবং এক ধারে দুটো এই আটটি ছোট টুকরো পাওয়া যাবে। দুটো তারের মাঝখানে কাঁচি দিয়ে দু'বার কাটা হয়েছে ব'লে ৬×৩—আঠারটা আস্ত সুতোর টুকরো হবে না।

৪। কেট্‌লি।

৫। চার টাকা পাবে। কারণ, খাড়াই চার ফুটের বদলে যখন সে দু'ফুট খাড়াই করল, তখনই সমস্ত কাজের অর্ধেক করা হ'ল। তারপর লম্বার দিকে অর্ধেক এবং চওড়ার দিকেও অর্ধেক করলে সম্পূর্ণ কাজটির আট ভাগের এক ভাগ করা হয়েছে। সেইজন্য সে ৩২৲ টাকার আট ভাগের ভাগ ৪৲ টাকা পাবে।

এটি ঘন ফলের অংশ। ঘন ফল—দৈর্ঘ্য×বিস্তার×বেধ (বা খাড়াই); এখানে ৪×৪×৪ —৬৪ ঘন ফুটের বদলে সে করেছে ২×২×২—৮ ঘ. ফু. এই জন্য ৪৲ টাকা পাবে। বত্রিশ টাকার অর্ধেক ষোল টাকা নয়।

৬। ত্রিশটি ফুল। ১ম মন্দিরে ১৫টি দিয়ে পুজো করে দরজার ১টি। থাকল ১৪টি। ২য় মন্দিরে ৭টি দিয়ে পুজো করে দরজায় ১টি। থাকল ৬টি। ৩য় মন্দিরে ৩টি দিয়ে পুজো করে দরজায় একটি। থাকল ২টি ৪র্থ মন্দিরে ১টি দিয়ে পুজো করে দরজায় একটি দিলে হাতে একটিও থাকবে না।

শেষ মন্দির থেকে হিসাব করতে হবে। কোন্ সংখ্যার অর্ধেক ও একটি দিলে কিছুই থাকে না—২; এই ভাবে।

নতুন বই

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

ছবি-আঁকা (গ)—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত। শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত কর্তৃক শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲

ছোট বেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে ছেলেমেয়েদের যে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়, তাকে অনেকেই উৎসাহিত করেন না দুটি কারণে। প্রথম কারণ হ'ল, ছবি আঁকায় অভিভাবকদের নিজেদেরই কোন অভিজ্ঞতা থাকে না বলে, এবং দ্বিতীয় কারণ এতে লেখাপড়ার (সম্ভবতঃ) ক্ষতি হয় বলে। আগে চিত্রশিল্প এদেশে মোটেই অর্থকরী ছিল না বলে, কোন ছেলে ছবি-আঁকায় মন দিলে বাড়ির সকলেই চটে উঠতেন, লেখাপড়ার ক্ষতি হবে বলে। তাছাড়া এ সম্বন্ধে ভাল বই পত্তর না থাকায় অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের কোন সাহায্যও করতে পারতেন বাড়িতে। বর্তমানে দৃষ্টিভঙ্গী অনেকেরই বদলেছে এবং শিল্পও অনেক অর্থকরী হয়েছে আগেকার তুলনায়। বইপত্তরও উৎকৃষ্ট ধরনের বেরুচ্ছে আজকাল ছবি আঁকার বিষয়ে।

প্রকাশক শিশু সাহিত্য সংসদ অনেক ভাল ভাল কাজের সঙ্গে ছোটদের ছবি-আঁকা শেখবার সহায়ক হিসাবে এই সিরিজের বইগুলি বার করে যথেষ্ট উপকার সাধন করেছেন। 'ছবি-আঁকা' সিরিজের এটি তৃতীয় বই। খ্যাতনামা শিল্পী নরেন্দ্রনাথ দত্ত অত্যন্ত যত্নসহকারে ও বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে ছবি-আঁকা শেখবার সহজ সরল উপায়গুলি অনেক ছবির সাহায্যে দেখিয়েছেন। রঙীন ছবি আঁকার নমুনা হিসাবেও ছবি আছে কয়েকটি। বইখানি হাতে পেয়ে ড্রয়িং-এর ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা যেমন উৎসাহিত বোধ করবে, তেমনি উপকৃতও হবে।

—

হুগলী নদীর তীরে—শ্রীবিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বসন্ত-কুটীর, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০

বিনোদবিহারী বিদ্যানিকেতনকে কেন্দ্র করে এবং তাঁর ছেলেদের নিয়ে এই কাহিনীর সূত্রপাত। অনেকগুলি চরিত্র আছে এর মধ্যে, কিন্তু আসলে হাবুলই এর নায়ক এবং তাকে নিয়েই গল্প এগিয়েছে। চন্দননগর গোন্দলপাড়ার হাবুল আর তার মেজমামার ঘটনার মধ্যে এসে পড়েছে বিপ্লবী দলের কথা—কানাইলালের কাহিনী। হাবুলের ঐ মেজমামাই জেলের মধ্যে কানাইলালের হাতে লুকিয়ে দিয়ে এসেছিল রিভালবার। কাহিনীটির সাজানোর ব্যাপারে কুশলী শিল্পীর পরিচয় না থাকলেও, ঘটনাটি বেশ রোমাঞ্চকর এবং পড়তে ভালই লাগে।

—

গ্রীক গ্রাহিকাদের কথা

হায়াসিন্থাস ফুলের ইতিকথা

অনেক, অনেক বছর আগে গ্রীস দেশের এক গ্রামে বাস করতো এক সুন্দর যুবক। হায়াসিন্থাস ছিল তার নাম। ভোরবেলার সূর্যের মতই সে ছিল উজ্জ্বল আর হাসিখুসী। স্বীকার করা ছিল হায়াসিন্থাসের ভারী ঝোঁক। পৃথিবীর কোন প্রাণীকে সে ভয় করতো না।

সূর্যদেবতা এ্যাপোলো এই সুন্দর হাসিখুসী বালকটিকে খুব ভালোবাসতেন। নিজের মন্দির আর ভক্তদের ছেড়ে তিনি হায়াসিন্থাসের সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। কখনও তার কুকুর-গুলোকে ধরতেন, কখনও বা তাকে তীর ছুড়তে সাহায্য করতেন। এমনি করে এ্যাপোলো ও হায়াসিন্থাসের দিনগুলি নদীর মত তর্‌তর্‌ করে বয়ে যেত।

বসন্তের এক সুন্দর দিন। বনে বনে ঘোরার পর ক্লান্ত হ'য়ে এ্যাপোলো আর হায়াসিন্থাস বনের প্রান্তে এক সুন্দর কুঞ্জের মধ্যে বিশ্রাম করছিলেন। বসন্তের শীতল হাওয়া তাদের তপ্ত দেহকে জুড়িয়ে দিচ্ছিল। ক্লান্তি-মুক্ত হয়ে এ্যাপোলো 'কুইটস্' খেলার প্রস্তাব করলেন। একটা লোহার বড় গোলককে আকাশে ছুড়ে দেওয়াই হোল 'কুইটস্' খেলা। সবচেয়ে যে দূরে ছুড়তে পারত সে হ'ত জয়ী। হায়াসিন্থাস আনন্দে সম্মত হলে, কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁদের খেলা জমে উঠল।

এ্যাপোলো একবার এত জোরে গোলকটা ছুড়লেন যে সেটা নীল আকাশ ভেদ করে মাটিতে সশব্দে এসে পড়ল। হায়াসিন্থাস বন্ধুর খেলায় মুগ্ধ হয়ে সেটা আনতে গেল, কিন্তু সেই ভারী জিনিসটা মাটিতে ধাক্কা খেয়ে তার কপালে এসে লাগল। পরক্ষণেই অস্ফুট আর্তনাদ করে পড়ে গেল সে।

এ্যাপোলো বন্ধুর দশা দেখে দৌড়িয়ে গেলেন তার কাছে। বুনো পানা খেতলে তার ক্ষতের উপর লাগালেন ; গভীর স্নেহে, ব্যাকুলতায় তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! ঝরা-ফুলের মতই হায়াসিন্থাসের জীবনদীপ নিবে গেল।

এ্যাপোলো বন্ধুর মৃত্যুতে শোকে-দুঃখে তাঁর চিরসাথী বীণা তুলে নিলেন, এবং যে মধুর

নর্তকী
শিল্পী : শ্রীসুলতা মিত্র

সঙ্গীত তাঁর বীণার তার থেকে ঝঙ্কৃত হল, সেই সঙ্গীত তাঁর হৃদয়ের বেদনাকে বহন করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। বনের পাতায় পাতায় কম্পন জাগিয়ে সেই সুর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার রেশ বনের অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে আরও করুণ করে তুলল।

বীণা রেখে নত হয়ে এ্যাপোলো হায়াসিন্থাসের ললাট স্পর্শ করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যেখানে হায়াসিন্থাসের মৃতদেহ পড়ে ছিল, সেখানে দেখা দিল এক অপূর্ব রক্তের মত লালফুল।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজও যখন পৃথিবীতে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হয়, তখন দেখা যায় বনের প্রান্তে কোমল দুর্বাদলে এক রক্তবরণ হায়াসিন্থ ফুল। বাতাস ফিসফিসিয়ে তার পাপড়ী দুলিয়ে যায়। আর ফুলটি যেন কানে কানে সূর্যদেবতার অকৃত্রিম ভালোবাসার স্মৃতি তাকে বলে ওঠে।

শ্রীউত্তরা সেন

—

শরৎ

নীল গগনের আকাশ পথে
শরৎ এসেছে আজি
সোনালী আলোয় ঝলমল করে
রঙীন পুষ্পরাজি।
সাদা সাদা মেঘ আকাশের পথে
চলিছে সুদূরে ভাসিয়া,
শিশির-ধৌত শ্যামল শোভায়
শিউলি উঠিছে হাসিয়া।
প্রান্তর মাঝে সাদা কাশফুল
উঠিছে হাওয়ায় দুলিয়া,
ভরা নদী জল হেসে হেসে কূলে
ছল্‌ছল্‌ পড়ে লুটিয়া।
অবিরাম ঝরা বাদলের পরে
নূতন ভূষণে সাজি
নীলগগনের আকাশ-পথে
শরৎ এসেছে আজি।

শ্রীরজতকান্ত রায়

—

দেখতে দেখতে পূজো এসে গেল। চারিদিকে খুসীর আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। শহরে যারা আছো তাদের তো আনন্দ উপভোগ করার অনেক পথ আছে, আর যারা শহর থেকে দূরে তাদের আনন্দ সীমাবদ্ধ হলেও প্রাণবন্ত। আমার তো মনে হয় শহরের বারোয়ারী পূজোর আঙিনায় দাঁড়িয়ে লাউডস্পীকারের কান-ঝালাপালা করা সঙ্গীত-পরিবেশনে যতটা আনন্দ পাওয়া যায়, গ্রামাঞ্চলের আড়ম্বরহীন বারোয়ারীতলার পূজোয় তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। তার স্নিগ্ধতা, পবিত্র-উৎসবকে আরও অনেক বেশী পবিত্র করে তোলে। শহরের পূজোর সকল পবিত্রতা ম্লান করে দেয় যখনই পূজো-প্যাণ্ডেল থেকে অহোরাত্র উচ্চগ্রামে বাঁধা লাউডস্পীকার সহযোগে অতি-প্রচলিত আধুনিক গানের সুর ভেসে আসে। শহরের পূজোয় আমাদের আনন্দ মাটি করে দেয় তার বাইরের চাকচিক্য। অন্তরের সাড়া তাতে পাই না।—যাহোক পূজো পূজোই! বাঙ্গালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের শারদীয়া পূজোর এই দিন কয়টির জন্যে আমরা সারা বছর অনেক আশায় বসে থাকি। সেই আশা সার্থক হোক, সুন্দর হোক, এই আমাদের একমাত্র কাম্য আর সেই সঙ্গে বলি :

শরতের কাশফুল শেফালির রাশি
বোধনের সুরে ভরে মিলনের বাঁশী
ভেদাভেদ দূর করে আসে শারদীয়া
সেই সুরে ভেসে যাক সবাকার হিয়া ॥

এবারে তোমাদের অনেক চিঠি পেয়েছি। সব চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। কিছু আগামীমাসের জন্যে রাখতে হোল। **রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়** (কোলকাতা)—তোমার বড় বড় অক্ষরে লেখা চিঠি পেলাম। স্কুলে যেতে ভালো লাগছে জেনে খুব খুসী হয়েছি। মন দিয়ে লেখাপড়া করো। **সুধাংশু ও মঞ্জু ঘোষ** (টালীগঞ্জ)—এরোপ্লেন আবিষ্কার করেন আমেরিকার রাইট নামে দুই ভাই। **হরিতোষ চট্টোপাধ্যায় ও শংকর দাস** (বালীগঞ্জ)—লেখনীবন্ধুর

ব্যবস্থা আগে ছিল—আপাততঃ বন্ধ করা হয়েছে। **শিকুল চক্রবর্তী** (বালীগঞ্জ)—তোমার চিঠিতে সুখবর পেলাম। আগে জানাওনি তো? মধুচক্রের মাধ্যমে দু'জনের আলাপ যা গড়ে উঠেছে তা মধুর হোক এই আশাই করি। **রণবীর মজুমদার** (লখনউ)—তোমাদের নতুন বাড়ী খুব ভালো লাগছে জেনে আনন্দ পেলাম। **সুবোধ খামারু** (২৪ পরগণা)—তোমার প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, ঐ লেখক দু'জনের বেশ কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল তা নাহলে এরকম মর্মস্পর্শী লেখা সৃষ্টি সম্ভব হত না। **জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** (বেণীপুর)—ঐ রকম কোন তারা আকাশে উঠতে দেখিনি বা শুনিওনি। সেইজন্যে ও সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত হবে না। **শিবানী রায়চৌধুরী** (কোলকাতা)—সংবিত্ত বিধির দীর্ঘ জবাব তুমি কি দিতে পারো? তোমাদের আলাপের সুখবর পেলাম। আলাপ সার্থক হোক। **চন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়** (কোলকাতা)—**অনামিকা চট্টোপাধ্যায়** (বরাহনগর)—**ঘনা ও শ্যামল দেব** (শিলং)—**দেববাণী মুখোপাধ্যায়** (বহুবাজার)—তোমাদের সকলের চিঠি পেয়েছি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো। তোমাদের—

মধুদি

পূজা-সংখ্যা মৌচাক

অন্যান্য বছরের মত এ বছরেও মৌচাকের কার্তিক সংখ্যা পূজার সংখ্যা হিসাবে আগামী মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। বহু নামকরা লেখক গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখবেন এই সংখ্যায়।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

মূল্য : চল্লিশ নয়া পয়সা

কিশোর-সাহিত্যের অমর গ্রন্থ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মারুতির পুঁথি ৩৷৹

'বনফুল'
রঙ্গনা ২৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
হেসে যাও ২৲
পোনুর চিঠি ১৷৷৹

বিমল মিত্র
টক্-ঝাল-মিষ্টি ২৲

প্রতিভা বসু
সব চেয়ে যা বড় ১৷৷৹

বুদ্ধদেব বসু
রান্না থেকে কান্না ১৷৹

অ-কু-ব
খামখেয়ালী ছড়া ১৹

পশুপতি ভট্টাচার্য
সুদূর দেশের রূপকথা ২৲

সীতা দেবী ও শান্তা দেবী
হিন্দুস্থানী উপকথা ৩৷৹

লীলা মজুমদার
হলদে পাখীর পালক ২৲

স্বপন বুড়ো
স্বপন বুড়োর মজার গল্প ১৷

শিবরাম চক্রবর্তী
নিখরচায় জলযোগ ১৷৷৹

রবীন্দ্র মৈত্র
মায়া বাঁশী ১৷৷৹

প্রত্যেকখানি বই ছবিতে ছাপায় অনবদ্য

নানা রঙের ছবিতে ভরা শিশু ও কিশোর-সাহিত্যে আর একখানি বিস্ময়কর প্রকাশ ভারত সরকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের মামার 'গপ্প' ২৸৹

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

দন্তমঞ্জনে নবপর্যায়

সুবিখ্যাত বীজবারক
ডেন্টনিক
ক্লোরোফিল সহযোগে
অধিকতর শক্তিশালী

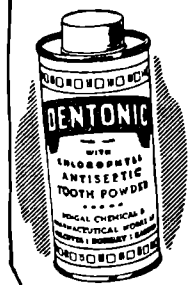

নির্মল মুখগহ্বর
দৃঢ় দন্ত ও মাঢ়ী
দুর্গন্ধহীন প্রশ্বাস
●
ক্লোরোফিল
ডেন্টনিক দন্ত
মঞ্জনে সহজলভ্য
হইবে

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

শরৎচন্দ্রের ছোটদের

শ্রীকান্ত

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব

কিশোর সংস্করণ

অসংখ্য চিত্রশোভিত

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

কর্তৃক সংক্ষেপিত

মূল্য ২·৫০

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মানুষের গন্ধ পাই	১·৫০
যখের ধন	১·৫০
মৃত্যু মল্লার	১·০০

জাহানারা বেগম চৌধুরী

স্কুলের মেয়ে	১·৫০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মরণের ডঙ্কা বাজে	১·৭৫

সুলতা কর

ছোটদের বিদেশী গল্প	১·২৫
অস্কারওয়াইল্ডের গল্প	২·৫০
এণ্ডারসনের রূপকথা	২·৫০
বিদেশী শিশু-নাটিকা	২·৫০
কাঠের পুতুল ক্ষুদিরাম	১·৫০

নদাশঙ্কর রায়ের

নতুন ছড়ার বই

ডালিম গাছে মৌ	২·০০
পাহাড়	১৷০
ইউরোপের চিঠি	১৷৷০

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

যূথপতি	১·৭৫
চিত্রগ্রীব	১·৭৫

বুদ্ধদেব বসু

বারো মাসের ছড়া	৩·০০

সুবোধ ঘোষ

পুতুলের চিঠি	৩·০০

বিমল দত্তের

লাফিং গ্যাস	০·৭৫
স্রেফ হাসি	১·০০
সহস্র মুখো শয়তান	১·০০
জঙ্গলের রাজা	০·৭৫

পুষ্প বসু

ভুতুড়ে	১·৭৫

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

বিজ্ঞান-ভারতী	৪·৭৫

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

কাব্য-সঞ্চয়ন	৫·০০
হসন্তিকা	১·৫০
শিশু-কবিতা	০·৪৭

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

সুখলতা রাওয়ের

ছড়ার বই

নতুন ছড়া

ছেলেমেয়েদের লেখায় ও রেখায় সুখলতা রাওয়ের নাম অনেক উঁচুতে। তাঁর এই ছড়ার বইখানি ছেলেমেয়েদের হাসাবে, ভাবাবে, শেখাবে। পাতায় পাতায় দু'রঙা ছবি। অপূর্ব প্রচ্ছদপট। ১·২৫

তুষারকান্তি ঘোষের

আরও বিচিত্র কাহিনী

সম্পূর্ণ বিস্ময়কর গল্প বলার ভঙ্গীতে লেখা। পাতায় পাতায় ছবি। ৩·০০

জগন্নাথ পণ্ডিতের

জগন্নাথের খেয়াল-খাতা

গল্পতো অনেক রকম পড়ো তোমরা কিন্তু সব গল্প তো মনে থাকে না, কারণ পড়ার সময় মনই থাকে না সব গল্পে। সত্যিকার মনকে ধরে রাখবার মত গল্প এতে আছে। অসংখ্য ছবিতে ভরপুর। ২·৫০

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

তোমাদের অভিনয়

কিশোরদের উপযোগী ছয়টি নাটক। অভিনয়ের জন্য ও পড়ার জন্য বিশেষ উপযোগী। ০·৬২

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

ছড়ার বই

রাঙা ধানের খৈ

ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি করার মত কতো যে মজার ছড়া আছে, হাতের কাছে একখানা বই নিয়ে দেখো। দু'রঙে ছাপা পাতায় পাতায় ছবি। ২·০০

বিমল দত্তের

সিংখুড়োর গল্প

এই হাসির গল্পগুলি পড়তে পড়তে পেটে খিল ধরে যাবে। শেষ না করে ওঠা যাবে না। পাতায় পাতায় ছবি। ২·০০

অবনীন্দ্র ঠাকুরের

একে তিন তিনে এক

সব বই ফেলে রেখে এই বই পড়তে হবে। হাতে পেলে খুসীতে ভরে উঠবে ছোটদের মুখ। ৩·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

ছোটদের উপযোগী হাসির নাটক। পড়তেও মজা লাগবে—

পণ্ডিত বিদায়	—	০·৫০
বাজার করার হাজার ঠ্যালা	—	০·৬২
প্রাণকেষ্টর কাণ্ড	—	০·৬২

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স্ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Regd. No. C. 1035.
(Approved by the Director of Public Instruction, Bengal, Notification No. 9 T. B. 23, Dec. 1938).